পৃথিবীর আশ্চর্য্য

একলব্য, বেহুলা, সতী, শৈব্যা প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২৪

মূল্য ॥০ আট আনা

কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পৃথিবীর আশ্চর্য্য।

পূর্ব্বাভাষ।

প্রাচীন লেখকেরা পৃথিবীর সাতটী আশ্চর্য্য দৃশ্যের কথাই জানিতেন—'সপ্ত' সংখ্যাটি তাঁহাদের প্রিয় বলিয়াই হউক অথবা সাতের অধিক ছিল না বলিয়াই হউক—তাঁহারা সাতটীর ইতিহাস মাত্র বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। এই সাতটীই—সেই প্রাচীন যুগের মানব-জাতির শিল্পোন্নতি ও অসাধারণ নির্ম্মাণ-কুশলতা ঘোষণা করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে উহাদের একটীরই চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়—অপরগুলির চিহ্নও বহু-কাল অতীত হইল একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষার গুণে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বহুবৎসর অনু-সন্ধানের পর কতকগুলির সংস্থান ও মোটামুটি বিবরণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ইউরোপে (ও প্রাচীন ইউরোপবাসী পৃথিবীর যে অংশের সহিত পরিচিত ছিলেন সেই অংশে) বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে—প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ প্রাধান্য সংস্থাপনের নিমিত্ত বিবিধ অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফলগুলিই পৃথিবীর আশ্চর্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর আশ্চর্য্য দৃশ্যের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আমরা যদি সহস্র বৎসর পরমায়ু পাই এবং দেশভ্রমণেই আমাদের সমুদায় জীবন ব্যয়িত করি তবুও এই সুবিশাল ধরণীর আশ্চর্য্য দৃশ্য ও পদার্থ সকল দেখিয়া উঠিতে পারি কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর আশ্চর্য্যের সংখ্যা করা যায় না। মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিকে বিজ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা অভাবনীয়, অত্যাশ্চর্য্য ও অমানুষিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তেমনই অন্য-দিকে স্বভাবের সৌন্দর্য্যমাধুরীময় স্থানসমূহের আবিষ্কার দ্বারা ভগবানের সৃষ্টির বিচিত্রতা প্রমাণিত হইতেছে। এই অসংখ্য আশ্চর্য্য সৃষ্টির মধ্যে আমরা মাত্র প্রধান প্রধান গুলির বিষয় এই পুস্তকে বর্ণনা করিব। অগ্রে প্রাচীন সপ্তাশ্চর্য্যের বিষয় আরম্ভ করি। এই সপ্তাশ্চর্য্য সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে—তাহা ত হইবারই কথা, কারণ পৃথিবীর সকল জাতির মনুষ্যের রুচি ও রীতিনীতি এক প্রকারের নহে—বিভিন্ন জাতির উন্নতির সহিত এই সপ্তাশ্চর্য্যের ইতিহাসও অল্পবিস্তর বিভিন্ন

আকার ধারণ করিয়াছে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সপ্ত দৃশ্যই পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য বলিয়া কথিত হয়। প্রথম—“বেবিলনের শূন্যোদ্যান”। নির্ম্মাণকৌশলে মিশর দেশের “পিরামিড্ই” অনেকের মতে সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু প্রাচীনত্বের তুলনায় পিরামিড্কে দ্বিতীয় স্থান দেওয়াই সঙ্গত। পিরামিড্ প্রস্তুত হইবার বহুবৎসর পূর্ব্বে এই বেবিলনের শূন্যোদ্যান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই হিসাবে বেবিলনের গঠন প্রণালীতে যে শিল্পোন্নতি দৃষ্ট হয় তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। ওলিম্পিয়াস্থ “জুপিটারের স্বর্ণমূর্ত্তি” তৃতীয় কীর্ত্তি। চতুর্থ—এফিসাসের ডায়না দেবীর মন্দির। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ “মেসোলিয়াম” পঞ্চম আশ্চর্য্য। “আলেকজান্দ্রিয়ার ফেরো” অথবা আলোকমঞ্চ ষষ্ঠ এবং রোড্স্ দ্বীপের “পিত্তল মূর্ত্তি-ই” সপ্তম আশ্চর্য্য।

১। বেবিলন।

এক সময়ে রমণীয় বেবিলন নগরীই শূন্যোদ্যানের ন্যায় শোভমান ছিল। গ্রীকভাষায় বেবিলন শব্দের অর্থ স্বর্গের দ্বার—আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ-কৌশলে বেবিলন নগর বস্তুতঃই সার্থকনামা হইয়াছিল। ইউফ্রেটিস্ (ফোরাত) নদীর উভয় তীরে, বর্ত্তমান বোগ্দাদ নগরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে বেবিলোনিয়া রাজ্যের রাজধানী বেবিলন নগর সমচতুর্ভুজের আকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নগরের প্রথম নির্ম্মাতা কে ছিলেন তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে অধিকাংশের মতে রাজা নিনাস্ তাঁহার পত্নী রাণী সেমিরেমিসের মনস্তুষ্টির জন্য এই নগরী তৈয়ার করাইয়াছিলেন। আবার অনেকের মতে এই নগরী নেবুসেড্নেজার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। প্রাচীন কবি হিরোডটাস্ও এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতার নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে এই নগরী একটী সমচতুর্ভুজের আকারে গঠিত, এই চতুর্ভুজের প্রত্যেক বাহু পনর মাইল লম্বা ছিল। বর্ত্তমান যুগের বহু সমালোচক এই নগরীর বিশাল পরিমাণ সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের জনসমাকীর্ণ প্রধান

প্রধান সহরগুলি যে পরিমাণে ক্রমশঃ আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ইহাতে বিরলবাসভবনযুক্ত বেবিলন নগরীর এই আকার সম্বন্ধে সন্দেহ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বেবিলন নগরে প্রাসাদের সংখ্যা বেশী ছিল না, মূলকথা বর্ত্তমান লণ্ডন অথবা প্যারীনগরীর ন্যায় ছিল না,—কিন্তু নগরীর প্রত্যেক প্রাসাদের চারিদিকেই কৃত্রিম পাহাড়, কুঞ্জবন, ফুলের বাগান, ফোয়ারা প্রভৃতি নির্ম্মিত ছিল। ১। প্রাচীর, ২। বেলাসের মন্দির, ৩। রাজপ্রাসাদ ও জলপ্রণালী, ৪। প্রাসাদ মধ্যস্থিত শূন্যোদ্যান এই চারিটীই বেবিলনের আশ্চর্য্য দৃশ্য।

১। এই নগরীর চতুর্দ্দিকে একটি প্রশস্ত ও বেশ গভীর পরিখা ছিল। পরিখা আগাগোড়া ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল এবং সর্ব্বদাই জল পূর্ণ থাকিত। এই পরিখা খনন করিয়া যে মৃত্তিকা পাওয়া গিয়াছে তাহাদ্বারাই ইষ্টক নির্ম্মিত করিয়া প্রায় দুইশত হস্ত পরিমাণ উচ্চ এবং পঞ্চাশ হাত পরিমাণ প্রশস্ত একটী প্রাচীর গঠিত হইয়াছিল। এই প্রাচীর নগরের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ছিল। প্রাচীরের বহির্ভাগে জলপূর্ণ পরিখা। আবার ঐ প্রশস্ত প্রাচীরের উপরে দুই কিনারা ধরিয়া ছোট ছোট গুম্বজাকৃতি দুই সারি ঘর ছিল। এই দুই সারির মধ্য দিয়া বেশ চওড়া রাস্তা ছিল—তাহাতে চারি

ঘোড়ার গাড়ী অনায়াসে যাইতে পারিত। নগর বেষ্টন-
কারী প্রাচীরের সর্ব্বশুদ্ধ ১০০ একশতটী সিংহদ্বার

ছিল। সুতরাং নগরের প্রতি দিকেই ২৫টী করিয়া দ্বার ছিল। এই সকল সিংহদরজা পিত্তল নির্ম্মিত, আকারে যে প্রকার বৃহৎ সেই প্রকার সুদৃঢ়ও ছিল। ফোরাত নদী নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নদীর দুই পারেই সহর। নদীর তীর দিয়া সহরের প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রবেশদ্বার আছে—দ্বার হইতে নদীর মধ্য পর্য্যন্ত ইষ্টকনির্ম্মিত সিঁড়ি। প্রতি দুইটী সিংহ-দ্বারের মধ্যস্থলে তিনটী করিয়া পাহারার মন্দির নির্ম্মিত ছিল। এই মন্দিরগুলি প্রাচীর অপেক্ষাও দশ ফুট উচ্চ। আবার সহরের চারিটী কোণের প্রত্যেক কোণেই চারিটী করিয়া ঐপ্রকার পাহারার মন্দির অবস্থিত। কিন্তু সমুদয়ে ২৫০টী মাত্র মন্দির ছিল। কারণ, সহরের যে দিকে একটী প্রকাণ্ড বিল সে দিকে পাহারার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই বিশাল চতুর্ভুজাকৃতি সহরে পাঁচিশটি রাস্তা ছিল। প্রত্যেক রাস্তা ঠিক সরল রেখার ন্যায় সহরের একপ্রান্ত-স্থিত সিংহদ্বার হইতে আরম্ভ হইয়া ঠিক বিপরীত প্রান্তের সিংহদ্বার দিয়া বাহির হইয়াছে। এই প্রকারে এক প্রান্তের রাস্তা অপর প্রান্তের রাস্তার সহিত কাটাকাটি হইয়া সহরটীকে ৬২৬ সমচতুর্ভুজে বিভক্ত করিয়াছে। এই সকল চতুর্ভুজের অধিকাংশ গুলিতেই

প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় নাই, স্বধু ফলফুলের বাগান, অথবা শ্যামল দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত মনোরম ভ্রমণের স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাসাদগুলি অতি দূরে দূরে তিন তালা চারি তালা করিয়া সম্পূর্ণ প্রাচ্য রুচি অনুসারে নির্ম্মিত।

ফোরাত নদীর উপর একটী প্রস্তর সেতু, উহাদ্বারাই নগরের উভয় অংশে যাতায়াত করা চলিত। তবে আমীর ওমরাহগণ কখনও কখনও নৌকাদ্বারাও পারাপার হইতেন। নদীর দুই তীরস্থ অংশ মিলিত করিলে বর্ত্তমান লণ্ডন নগরের ন্যায় পাঁচটী নগরের সমান হইত।

২। দ্বিতীয় আশ্চর্য্য হইল বেলাসের মন্দির—প্রকৃত প্রস্তাবে যে স্তূপস্তরের উপর এই মন্দির নির্ম্মিত তাহাই আশ্চর্য্য কৌশলে প্রস্তুত। একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের উপর একটী বিশাল চতুষ্কোণ মন্দির নির্ম্মিত। এই মন্দিরের প্রত্যেক প্রান্ত ৭০০ ফিট লম্বা আবার সেই মন্দিরের উপর পূর্ব্বটী অপেক্ষা একটু ছোট আর একটী মন্দির, আবার তাহার উপর অপেক্ষাকৃত একটু ছোট আর একটী, এই প্রকারে একটীর উপর আর একটী করিয়া ক্রমান্বয়ে আটটী মন্দির নির্ম্মিত। উচ্চতম মন্দিরটী প্রাঙ্গণ হইতে প্রায় ৬০০ ফিট উচ্চ। এই মন্দিরশ্রেণীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া একটী ঘূরান সিঁড়ি একেবারে উচ্চতমটীর তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

আবার ঠিক চতুর্থ মন্দিরের উপরে উঠিলেই একস্থলে বিশ্রামের জন্য কতকগুলি বসিবার আসন আছে। যদি কেহ এত সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে ক্লান্ত হন তবে বিশ্রাম করিতে পারিবেন। উচ্চতম মন্দিরটীতে বেলাসের প্রকোষ্ঠ অতি জাঁকজমকের সহিত সাজান। স্বর্ণনির্ম্মিত খাটের উপরে অতি উৎকৃষ্ট একখানি গদি ঠিক ঘরটীর মধ্যস্থলে ছিল, তাহার পার্শ্বেই একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত টেবিল স্থাপিত। বেলাস্ দেবের কোনও প্রতিমূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; কারণ, সকলেরই বিশ্বাস যে তিনি স্বয়ংই সেই উচ্চ মন্দিরে বাস করেন, তবে মর্ত্তবাসী তাঁহাকে দেখিতে পায় না। স্বর্ণনির্ম্মিত স্তম্ভ ও নানা প্রকার স্বর্ণের কারুকার্য্যে মন্দিরটী পরিশোভিত। হিরোডটাস্ বলেন এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রায় বিশ কোটী পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে। এই মন্দিরটি পূর্ব্বে পিরামিড্ বলিয়া কথিত হইত। মিশর দেশের পিরামিডের সর্ব্ববৃহৎটীও ইহা অপেক্ষা ছোট।

এই মন্দিরের আর একটী বিশেষত্ব ছিল যাহার জন্য সেই যুগে ইহার এত প্রতিপত্তি। সর্ব্বোচ্চ মন্দিরটীর প্রাঙ্গণে জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চ্চার উপযোগী যন্ত্রসমূহ স্থাপিত ছিল। এবং যে সময়ে দিগ্বিজয়ী আলেকজন্দার বেবিলন নগর অধিকার করেন সেই সময়ে তাঁহার সহিত

কেলিস্থেনিস্ নামক জ্যোতির্ব্বিদ্যাকুশল এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে সেই সময়ে বেবিলনের পণ্ডিতগণ প্রায় ১৯০০ উনিশ শত বৎসর যাবৎ জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চ্চা করিতেছেন এরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন। কথিত আছে এই সকল সংবাদ কেলিস্থেনিস্ বেবিলন হইতে গ্রীসে তাঁহার গুরু এরিষ্টট্ল্ এর নিকট পাঠান। বেবিলন নগর যিনিই প্রতিষ্ঠিত করুন, সম্রাট্ নেবুসেড্নেজার এর সময়ই এই নগরের সমৃদ্ধি চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই শক্ত্যভিমানী সম্রাট্ এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বহু চতুষ্কোণ মন্দির প্রস্তুত করেন। এবং সকলগুলি মন্দির পরিবেষ্টন করিয়া একটী বিশাল প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরে প্রবেশের জন্য প্রাচীরের মধ্যে কয়েকটী পিত্তল দ্বার সংযোজিত করেন। কথিত আছে জেরুসালেম মন্দিরের পিত্তল নির্ম্মিত পবিত্র জলপাত্র, পিত্তলস্তম্ভ প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ সম্রাট্ নেবুসেডনেজার বেবিলনে লইয়া গিয়াছিলেন তাহাদ্বারাই এই সকল মন্দিরের দ্বার ও অন্যান্য পিত্তল সজ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত মন্দির বেবিলনবাসীদিগের মহাদেবতা বেলাস্ অথবা বেলের নামে উৎসর্গীকৃত। বেল অথবা ব্যাল (Baal) বেবিলনিয়ান ভাষায় 'প্রভু' বুঝায়। এই বেল-

দেবের নাম বাইবেল্‌এ নিম্‌রড্‌ বলিয়া উল্লিখিত। নিম্‌রড্‌ এর অর্থ ইহুদীভাষায় 'বিদ্রোহী'। কথিত আছে এই নিম্‌রড্‌ একজন ঈশ্বরদূত ছিল কিন্তু ভগবানের প্রভু হইবার জন্য সে ঈশ্বর-বিদ্বেষী হয়। বেবিলনবাসী এই দেবতার উপাসনা করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের অপ্রীতিভাজন হন, এজন্য সম্রাট্‌ নেবুসেডনেজারের রাজত্বের প্রথম বৎসরে প্রফেট জেরিমিয়ার মুখদিয়া এই প্রত্যাদেশ করেন—"আরও ৭০ বৎসর অতীত হইলে আমি বেবিলনের রাজ্য ও সমস্ত জাতিকে এই বিদ্রোহের জন্য দণ্ড দিব।" এবং ফলেও তাহাই হইয়াছিল।

৩। ফোরাত নদীর উপর যে সেতু আছে তাহার দুই প্রান্তে দুইটী প্রাসাদ নির্ম্মিত। পূর্ব্বপ্রান্তস্থিতটী কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল—সম্রাট্‌ নেবুসেডনেজার সেতুর পশ্চিম প্রান্তে একটী নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত করেন। এই নূতন প্রাসাদটী পূর্ব্বটী অপেক্ষা আকারে প্রায় দ্বিগুণ ছিল। ইহার বেড় প্রায় আট মাইল হইবে। পূর্ব্ব কালের প্রথানুসারে এই প্রাসাদটী অতিশয় সুদৃঢ় করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাসাদটী বেষ্টন করিয়া একটীর বাহিরে আর একটী এই প্রকারে তিনটী প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কারুকার্য্যে ও ভাস্কর্য্যে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য না থাকিলেও ইহার আকার এই প্রকার

বিশাল ছিল যে পূর্ব্ব সময়ে এরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হইত না। নেবুসেডনেজার নির্ম্মিত বিশেষ আশ্চর্য্য-জনক কার্য্য মধ্যে ফোরাত নদীর তীর ও জলপ্রণালী আশ্চর্য্য কৌশলজ্ঞাপক। গ্রীষ্ম কালে যখন আর্মে-নিয়ান পর্ব্বতের বরফ গলিয়া যায়—তখন অপ্রশস্ত ফোরাত নদীর তীর ক্রমাগত বরফ গলা জলের বন্যায় ভাসিয়া যায় এবং প্রতিবৎসরই শস্যাদি নষ্ট করিয়া এবং বহুসংখ্যক গোমহিষমনুষ্য ও মনুষ্যাবাস ধ্বংস করিয়া বেবিলোনিয়া রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি করে। এই বিপদ হইতে প্রজাবৃন্দকে উদ্ধার করিবার মানসে সম্রাট্ বিভিন্ন দেশ হইতে পূর্ত্তকার্য্যকুশল অভিজ্ঞ লোক আনাইয়া ফোরাত নদী হইতে দুইটী খাল কাটাইয়া টাইগ্রিস্ নদীর সহিত সংযোগ করিবেন সুস্থির করেন। সেই অনুসারে ফোরাত নদীর পূর্ব্ব তীর হইতে বেবিলন নগরার্দ্ধের দুই পার্শ্বদিয়া দুইটী খাল কাটিয়া টাইগ্রিস্ নদীর সহিত মিলিত করা হয়। ফোরাত নদীর যে স্থান হইতে খাল দুটি আরম্ভ হয় সেখানে অতি কৌশলে ইষ্টক নির্ম্মিত দুটী বাঁধ দেওয়া হইল, যেন ফোরাত নদীর জল স্ফীত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত না আসিলে খাল দিয়া কিছু মাত্রও নদীর জল না যায়, নতুবা খাল সর্ব্বদা ফোরাত নদীর জলের সহিত সংযুক্ত থাকিলে অচিরে

ফোরাত নদী জলশূন্য হইয়া যাইবে। এই কৃত্রিম খাল দুটী আবার একটি বৃহৎ কৃত্রিম হ্রদের সহিত সংযুক্ত ছিল, নদীর জল বৃদ্ধি পাইলেই খাল দ্বারা এই হ্রদে আসিয়া পতিত হইত। এই সমস্ত কীর্ত্তি সেই যুগে অবশ্যই. অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ছিল কিন্তু জ্ঞানের উন্নতিতে উহা তত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া এইক্ষণ কেহ স্বীকার করিবেন না।

৪। বেবিলনে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল শূন্যোদ্যানগুলি। কথিত আছে স্বীয় মহিষী মিডিয়া রাজকন্যা এমিথিস্‌এর সন্তোষ সাধন জন্য নেবুসেড্‌নেজার এইগুলি বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মিডিয়া রাজ্য জঙ্গলাকীর্ণ ও পর্ব্বতময়। রাণী তাঁহার জন্মভূমির বিচ্ছেদে নিরতিশয় কাতর হইলে সম্রাট্ সেই জঙ্গলাকীর্ণ মিডিয়া রাজ্যের অনুকরণে বেবিলনকে কৃত্রিম পর্ব্বত ও বন উপবনে সজ্জিত করিয়া রাণীর বিষণ্ণতা দূরীকরণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই উদ্যান-গুলি আকারে প্রায় চারিশত ফিট দীর্ঘ ও চারিশত ফিট প্রশস্ত অর্থাৎ চারিশত ফিট বাহুবিশিষ্ট একটী চতু-র্ভুজের মত ছিল। বেবিলনে সেই সময় যত অট্টালিকা, মন্দির কি যাহা কিছু নির্ম্মিত হইত সমস্তই চতুর্ভুজের আকারে হইত, অন্য কোনও আকার দেখা যায় নাই।

প্রথমে কতকগুলি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে পরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান দ্বারা সেই স্তম্ভগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়াছে। আবার তাহার উপর স্তম্ভ ও খিলান এই প্রকারে নগরের বেষ্টনকারী প্রাচীরের সমান উচ্চ করা হইয়াছে। নিম্ন হইতে উপরিস্থ তলে উঠিবার জন্য দশ ফিট প্রশস্ত সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ খিলানের চতুর্দ্দিকে বাইশ ফিট চওড়া একটি প্রাচীর। এই খিলানের উপরে প্রথমে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর বসান হইয়াছে। এই প্রতি খণ্ড প্রস্তর ৮।১০ ফিট লম্বা ও ৪।৫ ফিট চওড়া হইবে। এই প্রস্তর বসান হইলে পর তাহার উপর সিমেণ্ট, কয়লার ছাই, নেপথা ও পেট্রলিয়ম ইত্যাদি খনিজ পদার্থের সহিত মিলিত করিয়া আস্তর করা হয়। ইহার উপর আবার দুই খানা করিয়া প্রস্তর গাঁথিয়া আবার মাটী দেওয়া হয়। এই সমস্তের উপর সীসের পুরুপাত দিয়া একেবারে মোড়াই করা হয়। তাহার উপরে বাগানের জন্য মাটী ফেলা হয়। বাগানটী সজীব রাখার জন্য যে জল সিঞ্চন করিতে হইবে তাহা যেন কোন প্রকারে ঐ সীসকপাতের মধ্য দিয়া চলিয়া না যায় এবং বাগানের মাটী শুষ্ক না হইয়া যায় সেজন্য ঐ খিলানের উপরিভাগ অতিশয় যত্ন সহকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহাতে অতি বৃহৎ

বৃহৎ বৃক্ষও এই উদ্যানে বাঁচিতে পারে এই জন্য সীসক পাতের উপরে অতি উচ্চ করিয়া মৃত্তিকা ফেলা হইয়াছিল। সমস্ত প্রস্তুত হইলে নানা দেশ বিদেশ হইতে বিখ্যাত গাছ ও চারা আনিয়া লাগান হইল। সে সময়ে যত প্রকার ফল ফুলের গাছ, লতা, শাক, সব্জি মানুষের জানা ছিল সকল রোপিত হইল। এই সকল বৃক্ষলতা যে শুধু সর্ব্বোপরিভাগে স্থান পাইল এরূপ নহে, উপরে উঠিবার সিঁড়ির দুই পার্শ্বও এই সকল বৃক্ষলতায় শোভিত হইল। দূর হইতে এই সকল শূন্যোদ্যান বৃক্ষলতাবৃত পিরামিডের ন্যায় দেখাইত। তার পরে আরও আশ্চর্য্যজনক হইল কৃত্রিম ফোয়ারা ও পাহাড়-গুলি। খণ্ড খণ্ড প্রস্তর দ্বারা কৃত্রিম পাহাড় প্রস্তুত হইল। তাহাতে নানা প্রকার লতা ও ছোট ছোট গাছ সৃষ্ট হইল। আবার এক একটির গাত্রে কৃত্রিম ফোয়ারা শীতল জল বিচ্ছুরিত করিয়া চারিদিক স্নিগ্ধ করিতেছে। সেই পুরাতন যুগে, সেই অর্দ্ধ সভ্যতার যুগে এত উচ্চ উদ্যানোপরি কি প্রকারে যে সুদূর নিম্নস্থ ফোরাত নদীর জল আনীত হইল ইহা সত্য সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। শ্যামল দূর্ব্বাবৃত ছোট ছোট মাঠ, তাহার পার্শ্বেই আবার ছোট ছোট হ্রদ, তাহাতেও কৃত্রিম উপায়ে জল রক্ষিত হইয়াছে। আবার স্থানে

স্থানে উদ্যানবাটিকার ন্যায় সুসজ্জিত ও সুগঠিত প্রাসাদমালা বিরাজমান। ফুলের বাগান, কৃত্রিম ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড়, হ্রদ, কুঞ্জবন, অভিনব কারু-কার্য্যখচিত নৃত্যশালা, মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত বিলাসভবন, আরও কত কি ইহার এক একটী বাগানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার শেষ নাই। সহজ কথায় ইন্দ্রের অমরাপুরী বুঝি মরজগতে বেবিলন নগরে স্থান পাইয়াছিল।

এইত গেল নির্ম্মাণ কৌশল। এখন ইহার রাজার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হয়। বহুলোকের মত, রাণী সেমিরেমিসের মনস্তুষ্টির জন্য রাজা নিনাস্ এই নগরী তৈয়ার করিয়াছিলেন। রাণী সেমিরেমিস্ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে সাধারণে গৃহীত প্রবাদটী এইরূপ ঃ—কোন সমুদ্রতলে এক মৎস্য-রাণীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কিন্তু নিষ্ঠুর মাতা সন্তান প্রতিপালনের ক্লেশ এড়াইবার নিমিত্ত নবপ্রসূত কন্যারত্নটীকে সমুদ্রতীরে একস্থানে রাখিয়া যান। দৈবানুগ্রহে এক ঝাঁক কবুতর আহারান্বেষণে সেই তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহারা নানা স্থান হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া ইহাঁকে খাওয়ায় এবং অতি কষ্টে সমুদ্র তীরস্থ পর্ব্বতগাত্রে একটী গুহায় লইয়া গিয়া রক্ষা

করিতে থাকে। পরে দৈবাৎ একদিবস কৃষক কার্য্যোপ-লক্ষে সেই গুহার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় ঐ শিশু কন্যাটী দেখিতে পায়। শিশুটীকে এরূপে নিঃসহায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহার মনে দয়ার সঞ্চার হয়। সে কন্যাটীকে আপন গৃহে লইয়া যায়। কৃষক ও কৃষকপত্নী অতি যত্নে এই কন্যাটীকে লালন পালন করিতে থাকে। ক্রমে ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইল, সেই সমুদ্র তীরে পরিত্যক্তা কন্যা একটী পরমা রূপসীতে পরিণত হয়। এই সময়ে একদিন রাজা নিনাস্ শীকারে বহির্গত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া যান। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে কাতর হইয়া রাত্রিযাপনের জন্য কৃষকের বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। তিনি এই কন্যার সাংসারিক কার্য্যতৎ-পরতা ও সর্ব্বোপরি সহাস্য সুন্দর বদন এবং মধুর স্বভাবে আকৃষ্ট হন। কৃষকের নিকট ইঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আরও মুগ্ধ হন। এবং ইঁহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। যথাসময়ে নিনাস্ কৃষক সহ ও কৃষকপত্নীসহ ঐ কন্যাকে রাজধানীতে লইয়া যান এবং মহাসমারোহে বিবাহ করেন।

বেবিলন নগরীর সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা যিনিই হউন না কেন এই নগরের সকল সমৃদ্ধি ও সজ্জার মূলে যে সম্রাট্ নেবুসেড্‌নেজার তাহার আর ভুল

নাই। কারণ, বর্ত্তমান যুগের পরিব্রাজকগণ বেবিলনের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে যাইয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, এখনও যে সকল ইষ্টক প্রাচীন বেবিলন ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে পাওয়া যায় তাহাতে সম্রাট্ নেবুসেডনেজারের নামাঙ্কিত। ইঁহার পিতার নাম নেবোপোলেসার। ইনি তত প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন না। নেবুসেডনেজার এসিরিয় রাজবংশের প্রধান রাজা। তিনি বাল্যকাল হইতেই তেজস্বী ছিলেন। কাজেই সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই পার্শ্ববর্ত্তী দেশ জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নেবুসেডনেজার এসিরিয়া রাজ্যের পূর্ব্বতন রাজধানী নিনেভাকে ধ্বংস করিয়া নূতন রাজধানী বেবিলনে আনয়ন করেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮৬ অব্দে, জুডিয়া আক্রমণ করেন এবং তদানীন্তন ইহুদী ও অন্যান্য ধর্ম্মমন্দির ও তীর্থস্থলগুলি ধ্বংস করিয়া তাহা হইতে বিবিধ ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও তৈজস-পত্র সমস্ত লইয়া আসিলেন। বেবিলনের পিত্তলের শত সিংহদ্বার সেই পিত্তল তৈজস-পত্র হইতে নির্ম্মিত। যে সোণা ও রূপা এই প্রকারে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা বেলাসের মন্দিরের স্থানে স্থানে বিবিধ নরনারীর মূর্ত্তি প্রস্তুত ও স্থাপিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে জেরুসেলম হইতে আনীত

ধাতুজ স্তম্ভ, জলপাত্র, আসন ও অন্যান্য আসবাব প্রভৃতি দ্বারাই সম্রাট নেবুসেড্‌নেজার তাঁহার নূতন দেবমন্দির অর্থাৎ বেলাস্‌ বা নিমরডের মন্দির সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি জেরুসেলম হইতে শুধু ধনরত্ন আনিয়াই ক্ষান্ত হন্‌ নাই, তথা হইতে ধনী মানী বহুসংখ্যক লোককে সপরিবারে বন্দী করিয়া লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার নূতন রাজধানী বেবিলনে তাহাদিগকে বাস করিতে বাধ্য করিলেন। জুডিয়া পারশ্য ইত্যাদি বহু স্থান জয় ও লুণ্ঠনের পর যখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে নিজরাজ্যে শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে বেবিলনকে মনোমত করিয়া সজ্জিত করিতে লাগিলেন।

বেবিলন কি প্রকার সুদৃঢ় ভাবে নির্ম্মিত এবং বহিঃশত্রুর পক্ষে এ নগরে প্রবেশ করা কি প্রকার কঠিন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকার বেবিলন নগরের ধ্বংস হইতে পারে এ কথা সেকালের কেহই ধারণাও করিতে পারে নাই। কিন্তু বেবিলন নগর যতই সুদৃঢ় হউক না কেন সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহা দাঁড়াইতে পারে এরূপ শক্তি ইহার কোথায়? নেবুসেড্‌নেজার প্রথমতঃ ঈশ্বরানুগৃহীত প্রফেট ঈশার পবিত্র মন্দির লুণ্ঠন করিয়াছেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট নন— ঈশ্বরবিদ্রোহী নিমরডের পূজায় ও সন্তুষ্টিসাধনে সেই

লুণ্ঠিত, আভরণ সেই সকল ধনরত্ন নিয়োজিত করিয়াছেন। এই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয়ই হইবে। সেই কারণেই ভগবানের নির্দ্দেশমত বেবিলন একদিন ধ্বংস পাইল। যখন বেবিলনের রাজা স্বীয় রাজধানী অমরাবতী তুল্য সাজাইয়া, স্বীয় শূন্যোদ্যানস্থ প্রমোদভবন হইতে নগরীর চারি দিকে—ফোরাত নদীর দূরস্থ—অতি দূরস্থ-শাখা-প্রশাখার দিকে সদম্ভ ও সাহঙ্কার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে-ছিলেন, তখন গম্ভীর দৈববাণী হইল "জেরুসেলম ধ্বংসের দিন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে বেবিলন রাজ্য ও তাহার রাজা দণ্ডিত হইবে।" নেবুসেড্‌নেজার কিন্তু জীবিত অবস্থায় বেবিলনের ধ্বংস দেখিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বেল্‌সেজার সিংহাসনে অধিরোহণ করে। পিতার ন্যায় তাহার কোনও গুণই ছিল না। সে অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ও অত্যাচারী ছিল। কাজেই রাজ্য নানা প্রকারে বিশৃঙ্খল হইল। এই সুযোগ পাইয়া মিডিয়া ও পারশ্যবাসীর প্রতিহিংসার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তাহারা পারশ্যরাজ সাইরাসের অধীনে এক বিপুল সেনা সংগৃহীত করিল। শুভক্ষণে বেবিলন ধ্বংসের জন্য এই সেনা যাত্রা করিল।

বেবিলনবাসী সর্ব্বদাই ফোরাত নদীটীকে তাহাদের দেশরক্ষার প্রধান সহায় মনে করিত; এইক্ষণ এই

ফোরাত নদীই তাহাদের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করিল। সাইরাস, দুই বৎসর যাবত বেবিলন অবরোধ করিয়া যখন দেখিলেন তাঁহার প্রয়াস বৃথা হইতেছে এবং জল ও আহার বেবিলনবাসী স্বীয় নগর হইতেই পাইতেছে, তখন ফোরাত নদীর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়াই একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিলেন।

সকল দেশেই বৎসরের মধ্যে এক দিবস বনভোজের ব্যবস্থা আছে। যেমন প্রাচীন ফরাসী বা ট্রোজানদিগের ভোজের জন্য একদিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেদিন কেহই কোনও কাজ করিত না, সকলেই নৃত্য, গীত ও ভোজের আনন্দে সময় কাটাইত, এই বেবিলোনিয়াবাসীদেরও সেইরূপ একটি দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই ভোজের আনন্দ উৎসবের দিন আগত হইলে সাইরাস সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। উৎসবের রাত্রে যেমন সামান্য কয়েক-জন পাহারা রাখিয়া সমগ্র বেবিলনবাসী পানাহারে ব্যাপৃত হইল অমনি সাইরাস একদল সেনা লইয়া যাইয়া পূর্ব্ববর্ণিত ফোরাত নদীর কৃত্রিম খালদ্বয়ের বাঁধ কাটিয়া দিলেন। হু হু শব্দে ফোরাত নদীর সমস্ত জল খালদ্বয় দিয়া বহিয়া চলিল। প্রহরেক মধ্যে ফোরাত নদী শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমি হইল। তখন সমস্ত সৈন্য লইয়া সাইরাস বেবিলনের পিত্তলদ্বার ভগ্ন করিয়া রাজধানীতে

প্রবেশ করিলেন। প্রহরীগুলিকে মারিয়া ফেলিতে বিস্তর সময় লাগিল না। পরে অতর্কিতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে হত্যা করিলেন। এবং বেবিলন নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। সাইরাসের মৃত্যুর পর ডেরিয়াস্ হিষ্টেস্‌পেস্ রাজা হন। এই সময়ে সাইরাসের মৃত্যুর বার বৎসর পরে বেবিলনবাসী স্বাধীন হইবার জন্য একবার চেষ্টা করে। ডেরিয়াস্ প্রায় দুই বৎসরের যুদ্ধের পর নগরী পুনর্গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি নগরের উচ্চ প্রাচীর পুনঃ বিদ্রোহের ভয়ে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। কয়েক বৎসর পরে জোরেফ্-সেসের রাজত্বকালে তিনি গ্রীস্ জয়ে বিফলমনোরথ হইয়া বেবিলনে আগমন করেন এবং এই সমরোদ্যোগের ব্যয় ভার উদ্ধারের জন্য বেবিলনের মন্দির ও প্রাসাদ ধ্বংস করিয়া তাহার বিপুল ধনরত্ন ও সংগৃহীত অমূল্য তৈজসপত্র লইয়া যান। এই প্রকারে বেবিলনের ধ্বংস সম্পূর্ণ হইল। পাপপথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বেবিলনের উচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল।

২। পিরামিড।

আফ্রিকার জনহীন বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরুভূমিকে যেন কৃত্রিম পর্ব্বতে সজ্জিত করিবার জন্যই প্রাচীন মিশর রাজগণ পিরামিড শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শস্য-শ্যামল নাইল নদীর উৎপত্তি স্থানগুলিকে যেন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই গম্ভীর সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট ভীষণাকার পিরামিড ও স্ফিন্‌ক্‌স্ দণ্ডায়মান। পিরামিডের আকার অতিশয় বৃহৎ—আশ্চর্য্যজনক বৃহৎ। ঐ প্রাচীন যুগে যখন বর্ত্তমান কলকারখানার সৃষ্টি হয় নাই তখন কি কৌশলে বৃহদাকার প্রস্তর সকল শত শত ফিট উচ্চ পিরামিড্‌এর শীর্ষদেশে স্থাপিত হইল ইহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। প্রাচীন ইতিহাসের জনক হিরোডটাস্ বলেন, "সেই শত শত রাজবংশের উত্থান পতন প্রত্যক্ষকারী পিরামিড দেখিলে সত্য সত্যই মন্ত্রমুগ্ধ হইতে হয়। পিরামিডের সৌন্দর্য্য অমানুষিক, অভাবনীয়, নীরব;—শ্রোতাকে মুখের কথায় আভাষ মাত্রও দেওয়া যায় না।" কেবলই চারিদিকে বালুকাময় সমতল ক্ষেত্র, যতদূর দৃষ্টি যায় আর কিছুই দেখা যায় না, মাঝে মাঝে এক একটী পিরামিড নভস্পর্শী শির উত্তোলন করিয়া দর্শকগণের

কৌতূহল উদ্দীপিত করিতেছে। আবার পিরামিডগুলি কেমন? দেখিলে মনে হয় না মর্ত্ত্যবাসীর কলাকৌশলে ইহা নির্ম্মিত—এক একটী পাহাড়ের টিলা যেন স্বভাবতঃই ঐ আকারে পরিণত হইয়াছে।

এই পিরামিড সকলের মধ্যে গিজের (Gizeh) পিরামিডই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এবং পৃথিবীর যাবতীয় অট্টালিকার মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইগুলি প্রায় খৃষ্ট অব্দের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সময়েও মিশরবাসী প্রস্তরকে যে কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে কাটিতে ও রীতিমত মসৃণ করিতে জানিত। আর কি প্রকারে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড-সকল জল কি স্থলপথে তিনশত কি চারিশত ক্রোশ বহন করিতে হয় তাহাও জানিত। প্রস্তর কাচের ন্যায় মসৃণ করা ও এত দূরদূরান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া এখনও প্রায় অসম্ভব বলিয়াই অনুমিত হয়। হিরোডটাস্ মেম্ফিসের (Memphis) পুরোহিতগণের নিকট হইতে জ্ঞাত হন—এই বৃহৎ পিরামিড খৃষ্ট পূর্ব্ব ৯০০ শতাব্দে মিশররাজ চিওপ্স্ (Cheops) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা প্রস্তুত করিতে এক লক্ষ লোকের কুড়ি বৎসর লাগিয়াছিল। এই পিরামিডের সর্ব্বনিম্নতম প্রকোষ্ঠে চিওপ্সের মৃত দেহ রক্ষিত হইয়াছিল। এই প্রকোষ্ঠের

চতুর্দ্দিকে একটি সুড়ঙ্গ ছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কৌশলে নাইল নদীর জল আনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টী চিওপ্‌সের ভ্রাতা রাজা সিফ্রেন কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছে। তৃতীয়টী চিওপ্‌স্ পুত্র মাইসেরিনাস্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

বড় পিরামিডটীর তলদেশ সমচতুষ্কোণ কিন্তু শীর্ষদেশ সূচ্যগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ। ভিত্তির প্রতি বাহুর পরিমাপ ৮০০ গ্রীকফিট। অতি মসৃণ প্রস্তর দ্বারা এইগুলি নির্ম্মিত, প্রতি খানি প্রস্তরফলক ত্রিশ ফিট্‌এর কম লম্বা হইবে না। প্রথমে বৃহৎ প্রস্তরফলকগুলি সোপানশ্রেণীর ন্যায় সজ্জিত ও স্থাপিত হইয়াছে। নানাপ্রকার কলকারখানা ও কাষ্ঠমঞ্চ দ্বারা প্রস্তরখণ্ড সকল মৃত্তিকা হইতে উত্তোলিত হইয়া পিরামিডের শীর্ষদেশে রক্ষিত হইয়াছে। এই শীর্ষদেশের নির্ম্মাণ শেষ হইলে পরে তাহার নিম্ন টায়ার বা সারিতে উপরোক্ত উপায়ে পাথর বসান হয়। এই প্রকারে পরিশেষে তলদেশ সম্পূর্ণ হয়। পিরামিড প্রস্তুত-কারী মিস্ত্রী ও মজুরগণের খাইবার খরচ মোট কত পড়িয়াছে তাহা প্রতি পিরামিড গাত্রেই মিশরদেশীয় ভাষায় ক্ষোদিত রহিয়াছে। প্রথম পিরামিড প্রস্তুত স্থিরীকৃত হইলে যে স্থান হইতে প্রস্তরখণ্ড সংগৃহীত হইবে সে স্থান হইতে পিরামিড প্রস্তুতের স্থান পর্য্যন্ত

একটি উচ্চ রাস্তা বাঁধান হয়। রাস্তাটী পিরামিডের দিকে ক্রমশঃ উচ্চতর করিয়া বাঁধাই হইতে থাকে পরিশেষে যখন পিরামিড প্রস্তুত স্থান পর্য্যন্ত আইসে তখন ঐ রাস্তা পিরামিডের তলদেশের সমান উচ্চ হয়। এই রাস্তা প্রায় ৬০ ফিট চওড়া এবং অতি মসৃণ প্রস্তরে প্রস্তুত। ইহার নির্ম্মাণকৌশলও আশ্চর্য্যজনক। কেহ কেহ পিরামিড অপেক্ষা এই রাস্তাই বেশী আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে করেন। ইহাতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্যের নিদর্শনও আছে। এই রাস্তা লম্বায় তিন সহস্র গ্রীক ফিটের কম হইবে না এবং প্রত্যেকটি পিরামিডই এক একটি পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত সুতরাং রাস্তাগুলি উচ্চতায়ও কম নহে। এ রাস্তাগুলি এখনও বিদ্যমান এবং এগুলি না থাকিলে অধিকাংশ পিরামিডএ যাতায়াতই অসম্ভব হইত। এ রাস্তাগুলিই পিরামিড প্রবেশের একমাত্র উপায়। পিরামিড প্রস্তুত করার সময় বৃহৎ প্রস্তরফলক সহজে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্যই এই সকল রাস্তা ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে রাস্তাগুলির অনেক অংশ ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে।

মিশর দেশ অতিশয় প্রাচীন যুগে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যতদূর জানা যায় রাজা মিনেস্ই এই দেশের প্রথম রাজা। তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ২২০০ অব্দে

রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। মিনেস্‌এর পর ৪।৫জন রাজা হন, তৎপর সর্ব্বপ্রধান পিরামিড নির্ম্মাতা চিওপ্‌স রাজা হন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৯২০ অব্দে মহাত্মা এব্রাহাম এই দেশ ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি এই দেশ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী দর্শন করেন; শস্য উৎপত্তি আশ্চর্য্যজনক এবং প্রায় সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যই উন্নতির পথে বলিয়া মনে করেন।

বস্তুতঃ মিশর দেশ অনেক প্রকারেই প্রসিদ্ধ। ধ্বংসাবশেষে এখনও যে কলাকৌশল বর্ত্তমান আছে, তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। ভাস্কর্য্য ও অন্যান্য শিল্পের সকলেরই যেন কি এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় ও ইহুদিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের বহুল ঘটনা ও কথা মিশর দেশের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। তারপর গ্রীস্‌দেশের সভ্যতা, শিক্ষা ইত্যাদি সকলই মিশর দেশ হইতে সংগৃহীত। মিশরদেশে যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা হইয়াছিল তাহারই শিক্ষায় গ্রীস্‌ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশারদ হইল। তারপর দর্শনশাস্ত্রে মোজেস্‌, পিথাগোরাস্‌, প্লেটো প্রভৃতি মহাত্মগণ দর্শন-শাস্ত্রের প্রস্রবণ দ্বারা সেই অতীত যুগে মানবশিক্ষার চরম সীমা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান চর্চ্চাও কম ছিল না—পিরামিড প্রস্তুত প্রণালী তাহার জ্বলন্ত

নিদর্শন। এই সমস্তের উপর মিশর দেশের শস্যোৎপাদিকা শক্তি সকল যুগেই জগদ্বিখ্যাত। এই সকল কারণে মিশর দেশ পৃথিবী মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান—শুধু পিরামিড দৃশ্য বা পূর্ব্ব ইতিহাস-প্রসিদ্ধির জন্য নহে। ইংরেজি বা ইউরোপীয় ভাষায় এই দেশের নাম ইজিপ্ট—কথিত আছে বেলাস্এর কোনও এক পুত্র এই দেশে আসিয়া রাজা হন। তাঁহার নাম ইজিপ্টাস্ (Ægyptus)। আরববাসী ও অন্যান্য প্রাচ্য জাতি এই দেশকে মেশ্র্ বা মিশর (Mesr or Misr) বলিয়া থাকে।

গ্র্যাণ্ড কেইরো নগর হইতেই পিরামিড সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। গ্র্যাণ্ড কেইরো হইতে পূর্ব্ব মুখে নাইল নদীর পূর্ব্ব তীরে প্রায় পাঁচ মাইল দূর হইতেই পিরামিড দেখা যায়। কিন্তু প্রথম দর্শকের পক্ষে ইহা তত অদ্ভুতাকার বা আশ্চর্য্যজনক বৃহৎ বলিয়া মনে হয় না। চারিদিকে মাঠ বা মরুভূমি থাকায় এবং উহার সহিত তুলনার যোগ্য উচ্চ কোনও প্রকার কিছু না থাকাতে পিরামিডের আকার দর্শনমাত্রে উপলব্ধি করা কঠিন। এই ৫।৬ মাইল দূর হইতেও পিরামিড অতি নিকটবর্ত্তী দেখায়, কিন্তু দর্শকগণ যতই অগ্রসর হইতে থাকেন পিরামিড যেন ততই পশ্চাতে সরিয়া

যাইতে থাকে—সে সামান্য দূরত্ব যেন আর শেষ হইতে চাহে না। ইহার প্রধান কারণ পিরামিডের বৃহৎ এবং চতুষ্কোণ আকার। ইহার গাত্র মসৃণ সুতরাং এত বৃহৎ আকারের কোনও একটি পার্শ্ব কখনও আংশিকরূপে দর্শকের চক্ষে প্রথম পতিত হয় না, সমগ্র পার্শ্বই একেবারে দৃষ্টিগোচর হয়; কাজেই দূরত্ব সম্বন্ধে এক ভ্রমাত্মক ধারণা সকলের মনে উদিত হয়। প্রাতঃকালের কোয়াসাচ্ছন্ন আলোকে পিরামিডগুলিকে মসৃণ গাত্রবিশিষ্ট এক পার্শ্বে হেলান পর্ব্বত বলিয়া ভুল হয়—ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলে যখন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় তখন তিনটী অতি বৃহৎ ও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পিরামিড পাশাপাশি রহিয়াছে মনে হয়। এক মাইল দূরে থাকিতেই দর্শকের মনে হয় যেন তিনি হাত বাড়াইলেই পিরামিড ছুঁইতে পারেন। বস্তুতঃ উহারা পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত নহে—এবং উহাদের প্রকৃত দূরত্ব একেবারে নিকটে না গেলে বুঝা যায় না। পিরামিডের তলদেশে দণ্ডায়মান হইলে উহার প্রকৃত আকার বুঝা যায়। এমন হৃদয়হীন বুঝি পৃথিবীতে নাই যে পিরামিডের তলদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উহার অসাধারণ আকার দেখিয়া মুগ্ধ না হয়—অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও উহার নির্ম্মাতার প্রশংসা না করে।

আকারে বৃহৎ পিরামিড এই চারিটিই, তবে মিশর দেশে বহু পিরামিড আছে। অপর সকলগুলি আকারে এত

বৃহৎ নহে। পিরামিডগুলি আমাদের দেশের মঠের ন্যায় গোলাকার (অর্থাৎ মোচার কর্ত্তিত অগ্রভাগের ন্যায়) নহে—চতুষ্কোণ, এবং যতই ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে

ততই ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে, সরু হইতে হইতে পরিশেষে প্রায় সূঁচের অগ্রভাগের মত তীক্ষ্ণ হইয়াছে। রাজা চিওপ্‌স্‌এর মৃতদেহ যেটিতে আছে সেই পিরামিডটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কথিত আছে এইটী তৈয়ার করিতে আনুমানিক ষাট কোটি টন প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সকল পিরামিডের অতি নিকটেই স্ফিন্‌ক্স্‌ অবস্থিত। ইহা আর কিছুই নহে, একটি পাহাড় প্রকাণ্ড মনুষ্য মস্তকের আকারে কর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকাণ্ড বলিলেও ইহার আকারের ঠিক অনুমান পাওয়া যায় না। কলিকাতা সহরের সমান বিস্তৃত ভিত্তিবিশিষ্ট একটি পাহাড়কে চক্ষু কর্ণ নাসিকা সম্বলিত মনুষ্য-মুখোসে পরিণত করিলে যাহা হয় এই স্ফিন্‌ক্স্‌ও তাহাই।

পিরামিডগুলি কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এত পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল এ সম্বন্ধে বহু মত আছে। কেহ বলেন, মিশরের প্রাচীন বিখ্যাত রাজা-রাণীদের সমাধিক্ষেত্র বিশেষভাবে চিহ্নিত রাখিবার জন্যই পিরামিডগুলি তাহাদের বংশধর বা পরবর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পিরামিডগুলি কেবল প্রধান ব্যক্তিগণের

সমাধিক্ষেত্রের স্মৃতি-রক্ষার্থই নির্ম্মিত হয় নাই, মিশরবাসী জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গ্রহ, উপগ্রহ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সহজ ভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্তই এই পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ এই প্রকারও বলিয়া থাকেন যে এগুলি সেই যুগের সভ্যতা, কলাকৌশল এবং বিজ্ঞান-চর্চ্চার নিদর্শন পরবর্ত্তী যুগবাসীদিগকে বিজ্ঞাপন করাইবার জন্যই নির্ম্মিত। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন যে এগুলি উর্ব্বর মিশর দেশের অপর্য্যাপ্ত কৃষি উৎপন্ন শস্য নিরাপদে রাখিবার গোলাবাড়ী রূপেই প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

৩। জুপিটার ওলিম্পিয়াস।

(প্রতিমূর্ত্তি)

ইন্দ্র যেমন আমাদের দেবতার রাজা—মেঘ, ঝড়, জল, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত প্রভৃতির কর্ত্তা, পঞ্চভূতের আধিপত্য লইয়া তিনি যেমন পৃথিবী শাসন-পালন করিয়া থাকেন, তেমনি গ্রীকদিগেরও দেবতার এক রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম "জুপিটার বা জোভ।"

জুপিটার সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ—তাঁহার ক্ষমতাও অসীম। তিনি পঞ্চভূতের কর্ত্তা; মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু, অগ্নি, বিদ্যুৎ বজ্র প্রভৃতি লইয়া তিনি প্রকৃতি-রাজ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। চক্ষের পলকপাতে মুহূর্ত্তে প্রলয় ঘটাইয়া পৃথিবী ধ্বংস করিতে তিনি যেমন পটু, আবার ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ জনগণকে রক্ষা করিতে—তাহাদের সৎকার্য্যের পুরস্কার দিতে সততই সেইরূপ মুক্তহস্ত। তিনিই ধনৈশ্চর্য্য, সুখ-সৌভাগ্য দান করেন, দেশের লক্ষ্মী-শ্রী রক্ষা ও বৃদ্ধি করেন, সভ্যতার সহিত শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করিয়া থাকেন, সেই নিমিত্তই গ্রীস্‌দেশবাসিগণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে সর্ব্বদাই তাঁহার পূজা-আরাধনা করিত। দেশের নানা স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুদৃশ্য মন্দির সকল নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে 'জুপিটারের' নয়ন-মনোরঞ্জন ধাতু ও রত্নময় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিত। ইহার মধ্যে ওলিম্পিয়াস্থ ইলিস্ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত "জুপিটার" প্রতি মূর্ত্তি সর্ব্বপ্রধান এবং পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

জুপিটারের প্রসিদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি গ্রীস্‌দেশে কিন্তু জুপিটারের পূজা প্রথম আরম্ভ করে রোমীয়গণ। রোম তখন সকল দেশের মস্তকের মণি—সভ্যতার জননী। ধন, ঐশ্বর্য্য,

সুখ, সমৃদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, বীরত্ব, ও শিল্পের লীলাভূমি। অন্যান্য সকলে তাহার প্রতি গৌরবময় চক্ষে চাহিয়া থাকিত এবং সর্ব্ববিষয়ে তাহার অনুকরণ করিবার প্রয়াস পাইত, সুতরাং দেবরাজ "জুপিটারের" বিবরণ সত্বরেই দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তিপূর্ণ-চিত্তে জনগণ আসিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল, নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে "জুপিটার" আপন একাধিপত্য বিস্তার করিয়া লইলেন। এইরূপে গ্রীসেও এই পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রাচীন ইটালী ও গ্রীসে তখন ভাস্কর্য্য শিল্পের যত উন্নতি হইয়াছিল—পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে তদ্রূপ হয় নাই। পথে ঘাটে, হাটে, মন্দিরে, যথায় তথায় নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সকল স্থাপিত হইয়া নগরের শোভা বৃদ্ধি করিত। রোমীয়গণ তাহাদের দেবতার একাধিপত্য দেশ-বিদেশে বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের দেবতাগণের এমন চমৎকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিত, যে তাহাদিগের দিকে চাহিলে মন স্বতঃই ভক্তি, বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িত—তাহাদিগকে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ ভাবিয়া সকলে সভয়ে পূজা-অর্চ্চনা করিত। নিত্যই দলে দলে লোকজন আসিয়া মন্দির ছাইয়া

ফেলিত। পুরোহিতগণও সময় ও সুযোগ বুঝিয়া দেবগণ সম্বন্ধে নানা কথা, গল্প, উপন্যাস ও ইতিহাস রচনা করিয়া শুনাইত—তাহাতে তাহাদের বিস্ময় ও ভক্তির মাত্রা দশগুণ বাড়িয়া যাইত।

বাস্তবিক পক্ষে ভাস্কর্য্যে রোমীয়গণ অপেক্ষা গ্রীক শিল্পিগণের ক্ষমতা ও দক্ষতা এমন অদ্ভুত ছিল যে, কোন বিষয়ে কোন স্থানে সামান্য মাত্র খুঁত থাকিত না। কি নির্ম্মাণ-কৌশল, কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন, কি বর্ণের স্বাভাবিকতা, কি হাব-ভাবের বিকাশ—সর্ব্ববিষয়েই তাহারা স্বভাব ও সত্যের অনুরূপ হইত। বিশ্বনিন্দুক সমালোচকগণ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াও কোন স্থানেই কোন প্রকার ত্রুটি বাহির করিতে পারিত না। চক্ষে দেখিলে—তাহারা যে মনুষ্যহস্ত নির্ম্মিত, তাহা অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক—মনে হইত, দেবগণ বুঝি সত্য সত্যই স্বর্গ ছাড়িয়া তাহাদের কার্য্যাকার্য্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিবার জন্যই সেই সকল মন্দির মধ্যে আসিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। সুতরাং দেশবাসী প্রজাপুঞ্জ হৃদয়ের সমস্ত বিশ্বাস ও ভক্তি ঢালিয়া তাহা-দিগকে পূজা করিত। ইহাতে দেশবাসী জনগণের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় হইত, রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইত,

ধর্ম্ম ও দেশের প্রতি আকর্ষণ অটল—অচল থাকিত, সকলেই সুখ-শান্তির ক্রোড়ে নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিয়া সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিশালী হইত। এই জন্যই তখন সাম্রাজ্য মধ্যে চতুর্দ্দিকে দেব-মূর্ত্তি সকল বিস্তার হইয়া পড়িয়াছিল।

'জুপিটার ওলিম্পিয়াসের' প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে রোমান ও গ্রীকরাজ্যে 'জুনো' ও 'মিনার্ভা' দেবীর প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তন্মধ্যে আবার দেবী 'মিনার্ভার' প্রতিমূর্ত্তিই অদ্ভুত ও অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইত। বাস্তবিক তেমন চমৎকার—তেমন প্রকাণ্ড—তেমন অদ্ভুত ব্যাপার পূর্ব্বে কেহ কখনো কল্পনাও করিতে পারে নাই। যখন সে মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল—তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া ভাবিল যে, নির্ম্মাতা অদ্ভুত দৈবশক্তিসম্পন্ন, নচেৎ মনুষ্য-শক্তিতে এ প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার সমাধান হওয়া নিতান্তই স্বপ্নাতীত ব্যাপার!

'মিনার্ভা' দেবীর প্রতিমূর্ত্তি হস্তিদন্ত ও সুবর্ণে নির্ম্মিত, ঊনচল্লিশ ফিট দীর্ঘ। এত দীর্ঘ এবং প্রকাণ্ড হইলেও গঠন ও বর্ণের সামঞ্জস্য অতুলনীয়। ইহার মূল্য ১২০০০০ এক লক্ষ কুড়ি হাজার পাউণ্ড। 'ফিডিয়াস' নামক এক শিল্পী এই প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া দেশ-বিখ্যাত হইয়া পড়িল।

'ফিডিয়াস' খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪৯০ শতাব্দীতে এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে গ্রীস্‌দেশে ভাস্কর্য্য শিল্পের অত্যন্ত আদর বাড়িয়াছিল, সুতরাং যে কেহ সেই শিল্পের শিক্ষা ও চর্চ্চায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন —সকলেই অল্প-বিস্তরভাবে প্রতিপত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কালে 'ফিডিয়াস্‌ই' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

সাইমনের রাজত্বকালে অল্পবয়স্ক হইলেও ফিডিয়াস্‌ সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শীঘ্রই স্বীয় গুণগ্রাম ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। যখন পেরিক্লস্‌ এথেন্সের সর্ব্বময় হর্ত্তা কর্ত্তা হইলেন, তিনি ফিডিয়াসের শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই নগরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। যত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ, খোদাই কার্য্য ও সৌন্দর্য্যময় প্রতিমূর্ত্তিসকল, সমস্তই তাঁহার নেতৃত্বাধীনে তাঁহারই আদর্শ, আদেশ ও উপদেশ-মতে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। সেই সকল চমৎকার চমৎকার অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে ফিডিয়াসের নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল।

যিনি যে কার্য্যই করুন না কেন, সে কার্য্যে যদি প্রাণপর্ণ শক্তি চেষ্টা ও মস্তিষ্ক নিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার উন্নতির পথে কেহই বাধা জন্মাইতে পারে

না—স্বয়ং ভগবান তাঁহার সহায় হন। ফিডিয়াস তাঁহার কার্য্যে এমন একাগ্রতা, শক্তি, চিন্তা, প্রাণ, মন অর্পণ করিলেন যে অচিরেই এমন দিন আসিল যখন তাঁহার পরিশ্রমের ফল ফলিল, ভগবান আপনি সহায় হইয়া তাঁহার সুনাম, জগদ্ব্যাপী করিয়া দিলেন।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ ও ছোট বড় নানাবিধ খোদাই কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যে তিনি যদি গ্রীস্‌দেশীয় দেবতাবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের একটি অভূতপূর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। তখন হইতেই তিনি সেই-বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন এবং সেই সকল ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য দেশের সমস্ত পুরাণ, ইতিহাস ও বড় বড় কবি এবং লেখকদিগের পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিলেন।

গ্রীস্‌দেশে প্রথমে 'আবলুশ' প্রভৃতি কাষ্ঠে ছোট ছোট মূর্ত্তি খোদাই করা হইত, পরে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে মৃত্তিকায় ও প্রস্তরে সেই সকল কার্য্য হইতে লাগিল, অবশেষে ধাতুতে এবং হস্তিদন্তে সেই সকল কার্য্যের চরম উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইল। সেই সময়ে ফিডিয়াস্ হস্তিদন্ত ও স্বর্ণে 'মিনার্ভা' দেবীর সেই ঊনচল্লিশ ফিট উচ্চ প্রকাণ্ড অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া দেশ বিখ্যাত হইলেন।

কিন্তু মানবের ভাগ্য চিরদিন এক ভাবে যায় না। সুখের পর দুঃখ—দুঃখের পর আবার সুখের দিন আসে। ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ফিডিয়াসের সুখ-সৌভাগ্যের সূর্য্য মেঘে ঢাকিল, তাঁহার নামে প্রতারণা ও অপহরণের অভিযোগ উপস্থিত হইল।

কুবেরের ভাণ্ডারের মত—অত বেশী মূল্যে 'মিনার্ভা' দেবীর সেই অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করার পর দেশময় যখন তাঁহার যশ ও খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল—অমনি পরশ্রীকাতর হিংসুকদিগের প্রাণে যেন শেল বিদ্ধ হইল। তাহারা ফিডিয়াসকে নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিল, এবং তাঁহার নামে "মিনার্ভা" দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্যের স্বর্ণ ও অর্থ অপহরণের অভিযোগ দিল। এরূপ অপরাধে তখন নির্ব্বাসন এবং প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত, সুতরাং ফিডিয়াস্ জন্মভূমি এথেন্স ছাড়িয়া 'এলিশ' প্রদেশে পলায়ন করিলেন।

অনেক সময়ে দেশবাসীর মন্দ অভিপ্রায়ের ভিতর দিয়া ভগবান অনেক মহত্তর কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। ফিডিয়াসের ভাগ্যেও তদ্রূপ ঘটিল—স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নই তাঁহার অমর খ্যাতির সূত্রপাত করিয়া দিল।

'এলিশ' প্রদেশে 'ওলিম্পিয়া' নামক স্থান গ্রীকগণের

নিকট পরম পবিত্র বিবেচিত হইত। সেই স্থানে সে দেশবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ "জুপিটার ওলিম্পিয়াসের" এক প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিবার জন্য ফিডিয়াসকে আনয়ন করিয়া সেই কার্য্যে নিয়োগ করিল।

স্বদেশবাসিগণের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে ফিডিয়াস বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহাদের উপর দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল। তিনিও এই সুযোগে মনের ক্ষোভ মিটাইবার অবসর পাইলেন, এবং এলিশবাসিগণের প্রস্তাব পরম আগ্রহে গ্রহণ করিলেন।

তিনি স্থির করিলেন পেরিক্লসের আজ্ঞায় এথেন্সে "মিনার্ভা" দেবীর যে ঊনচল্লিশ ফিট্ উচ্চ অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন, দেশদেশান্তরে যে প্রতিমূর্ত্তির গৌরব-খ্যাতি রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, সেই গৌরব গর্ব্ব যদি তিনি কোন উপায়ে খর্ব্ব করিয়া দিতে পারেন, তবেই এথেন্সবাসীর দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ দেওয়া হইবে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ফিডিয়াস তাঁহার এই মহত্তম দ্বিতীয় কার্য্যে এমন শক্তি, পরিশ্রম, চিন্তা ও মস্তিষ্ক অর্পণ করিলেন যে তাঁহার এবারকার এই কার্য্য পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব, প্রধান, আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া চিরদিনের জন্য ইতিহাসে অমর খ্যাতি লাভ করিল।

ফিডিয়াস ‘জুপিটার ওলিম্পিয়াসের’ প্রতিমূর্ত্তি গঠনে মহাকবি হোমরের মহাকাব্যের বিবরণ গ্রহণ করিলেন এবং অদ্ভুত প্রতিভাবলে সেই কাব্যগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির গঠনকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

“জুপিটার ওলিম্পিয়াসের” প্রতিমূর্ত্তিও হস্তিদন্ত এবং স্বর্ণে নির্ম্মিত হইল—এ মূর্ত্তি সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট, তথাপি তাঁহার মস্তক প্রায় মন্দিরের ছাদ স্পর্শ করিল, সে ছাদ মন্দিরের মেঝে হইতে ৬০ ষাট্ ফিট্ উচ্চ, সুতরাং উপবিষ্ট অবস্থাতেই দীর্ঘে সে প্রতিমূর্ত্তি আটান্ন-ঊনষাট ফিটের কম হইল না। এক্ষণে অনুমান করুন—সে কি বিরাট ব্যাপার!

কেবল তাহাই নহে—দীর্ঘে যেরূপ, প্রস্থে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনেও তাহারই অনুরূপ। বৃক্ষশাখায় তাঁহার শিরস্ত্রাণ শোভিত, দক্ষিণ হস্তে ‘বিজয়-দেবতার’ স্বর্ণ ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি, বাম হস্তে নানা উজ্জ্বল ধাতু নির্ম্মিত দীর্ঘ রাজদণ্ড—সেই দণ্ডশীর্ষে সুবর্ণ নির্ম্মিত ঈগল্ পক্ষী। প্রতিমূর্ত্তির পরিচ্ছদ সুবর্ণনির্ম্মিত—তাহাতে নানা প্রকার পশুপক্ষী এবং ফুল-ফল অঙ্কিত।

সিংহাসনটিও অতি অপূর্ব্ব—কল্পনার অতীত। হস্তিদন্ত এবং ‘আবলুস্’ কাষ্ঠের উপর স্বর্ণ এবং বহুমূল্য

অত্যুজ্জ্বল রত্নরাজি খচিত হইয়া নির্ম্মিত—তাহাতেও নানাপ্রকারের মনুষ্য, দেবতা, পশু-পক্ষী অঙ্কিত।

সে প্রতিমূর্ত্তি যখন নির্ম্মিত হইল, তখন দেশ দেশান্তরে তাহার খ্যাতি "মিনার্ভা" প্রতিমূর্ত্তির গৌরবকে চিরদিনের জন্য খর্ব্ব করিয়া দিল। জনসঙ্ঘ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল—মনুষ্য-শক্তির কথা দূরে থাকুক, এ বিরাট ব্যাপার কল্পনারও অতীত। সেই হইতে পৃথিবীর ইতিহাসে ফিডিয়াস্ ও তাহার অপূর্ব্বকার্য্য অমর খ্যাতি লাভ করিল।

৪। 'ডায়েনা' দেবীর মন্দির।

'এফিসিয়াসে' 'ডায়েনা' দেবীর মন্দির পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে অন্যতম। কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হয়,—অধুনা তাহার আর চিহ্নমাত্র না থাকিলেও, এক-কালে তাহার গৌরব-গাথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়াছিল।

'ডায়েনা' রোমীয়দিগের দেবতা হইলেও তাঁহার নাম দেশ-দেশান্তরে ব্যাপৃত হইয়াছিল এবং এসিয়ার মধ্যেও অনেক দেশে অনেক জাতি তাঁহার পূজা করিত, বড় বড় মন্দির মধ্যে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া—সেই

সংকল মন্দির তীর্থস্থানরূপে জ্ঞান করিত এবং তাহাদের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য দেশের লোক প্রাণপাত করিত। এইরূপে এফিসিয়াসের ডায়েনা দেবীর মন্দিরও পৃথিবীর মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এসিয়া-মাইনর প্রদেশে এফিসিয়াস একটি প্রধান নগর। পূরাকালে এ নগর পৃথিবীমধ্যে মহা সমৃদ্ধিশালী ও সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। বড় বড় কবি ও লেখকগণ ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা ও যশ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এফিসিয়াস বড়ই সৌভাগ্যবান ছিল। সমুদ্রতীরে—স্মার্ণা প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে শোভাময় নগর আপনার সৌন্দর্য্য-গর্ব্বে বহুকাল পর্য্যন্ত উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিল। একদিকে অভ্রভেদী শৈলমালা আকাশচুম্বিত শির উচ্চ করিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ বন্ধনে অগ্রসর, অন্যদিকে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি তুলিয়া—হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া মধুর গম্ভীর-গীত গাহিতে গাহিতে পদপ্রান্ত চুম্বনে তৎপর! নানা দেশ-দেশান্তরের বাণিজ্যপোত নানা প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া সর্ব্বদাই মধুমক্ষিকার মত

বন্দর ছাইয়া ফেলিত। কত সাধু, কত কবি, কত মহা-পুরুষ নিয়ত পদার্পণে নগরকে ধন্য করিতেন। দেশে দেশে "এফিসিয়াসের" গৌরব-গাথা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া জনগণকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া দিত! দেশবাসী সকলেই পরিশ্রমী—সকলেই সুখী—সকলেই লক্ষ্মীমন্ত। চারিদিকে অবাধ বাণিজ্যে নিয়তই নগরের ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিত।

কিন্তু হায়, এক্ষণে সে অতীত গৌরব-কাহিনী নিদাঘ নিশীথের স্বপ্নঘোরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কালে সাগর মরু হয়—মরু সাগরে পরিণত হয়, মানবের সুখ, সৌভাগ্য, বীরত্ব, গর্ব্ব, সকলই লয় প্রাপ্ত হয়—জগতে কালই একমাত্র বলবান।

সেই মহাবলবান কালের মহিমায় এক্ষণে এফি-সিয়াসের যথাসর্ব্বস্ব অতীতের অন্ধতম গর্ভে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে—চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল তাহার নামমাত্র অতীতের কীর্ত্তিকাহিনী মানব-হৃদয়ে স্মৃতির মন্দিরে জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন বিশ্বসংসার প্রলয়ের গর্ভে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত না করিবে—ততদিন সেই অমর নাম দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে আপনার অতীতের সুখময় স্মৃতিগুলি জাগাইয়া রাখিবে।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই মহাজন বাক্য অক্ষরে

অক্ষরে সত্য। এফিসিয়াসের সকলই গিয়াছে, কিন্তু তাহার নাম অমর—চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এখনো সে নাম স্মরণে লোকের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তির আবির্ভাব হয়—আমরা অবাক্ হইয়া তাহার কীর্ত্তি-কাহিনী হৃদয় মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলি।

এফিসিয়াসনগরের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি দেবীও তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। যে নগরের পদ ধৌত করিয়া, যাহার বন্দরে অর্ণব-পোত সকল বহিয়া আনিয়া জলনিধি এককালে আপনাকে ধন্য ভাবিত, এখন সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া দূর-দূরান্তরে সরিয়া গিয়াছে। সেস্থান এক্ষণে কদর্য্য জলাভূমি ও পীড়াদায়ক জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ হইয়া মসককুলের আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। অহোরাত্র দূষিত বাষ্প উঠিয়া নানা সংক্রামক ব্যাধির জন্মভূমি হইয়াছে। সেস্থানের বায়ু-প্রবাহেও ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া ও জীবন-নাশী জ্বর-জ্বালা রাক্ষসের মত মুখ-ব্যাদান করিয়া ছুটিয়া আসে, কাহার সাধ্য যে তাহার সন্নিকটে পদার্পণ করে? কেবলমাত্র জঙ্গলপূর্ণ কতকগুলি ছোট বড় মৃত্তিকা-স্তূপ আপনার অতীতের ইতিহাস গর্ভে লুকাইয়া এখনো লুপ্ত গৌরবের সাক্ষী-স্বরূপে বিরাজ করিতেছে।
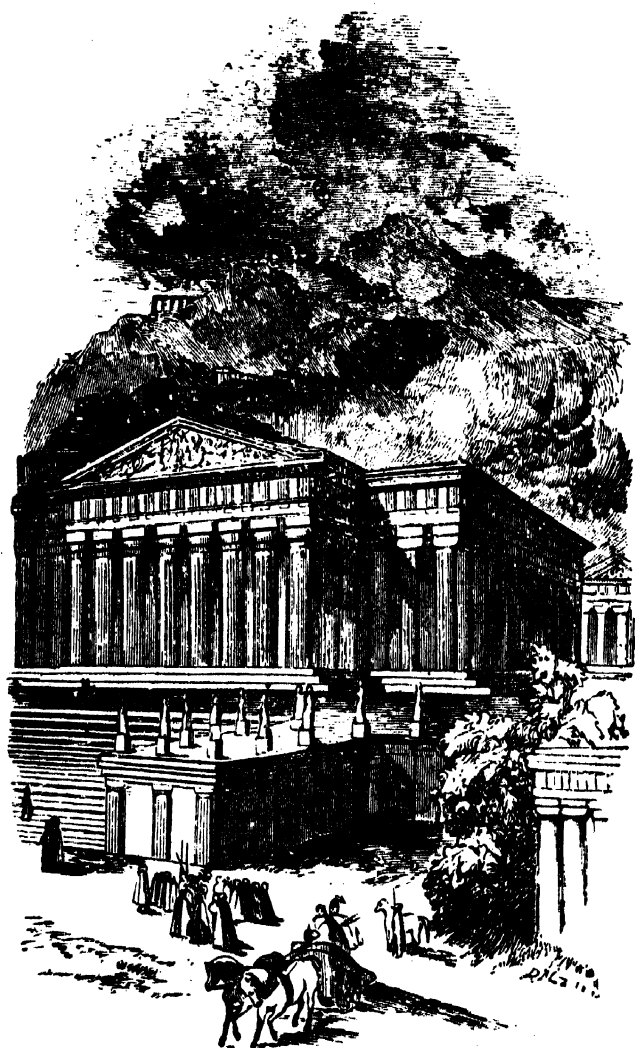
সে নগর সর্ব্বপ্রথমে যে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয়তা নাই। নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন—"এসিয়ামাইনর" প্রদেশ নিবাসী 'ক্রীসস্' নামক এক ব্যক্তির পুত্র "এফিসস্" আপন নামে সেই নগর স্থাপন করেন। কেহ বলেন "হারকিউলিসের" দ্বারা প্রতারিত হইয়া 'এমেজন্' জাতি সর্ব্বপ্রথমে সেখানে পলাইয়া আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

যিনি যাহাই বলুন, যে জাতি সেখানে আসিয়া প্রথমে নগর পত্তন করিয়াছিলেন—তাঁহারাই যে কালক্রমে মহা সমৃদ্ধ হইয়া "এফিসিয়াস" নগরকে পৃথিবীর একটি সৌন্দর্য্যময় শ্রেষ্ঠ নগরে পরিণত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই নগরে যখন ডায়েনা দেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইল—তখন তাহার গৌরব-গাথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বাস্তবিক তেমন মন্দির তেমন অদ্ভুত ব্যাপার কেহ কখনো স্বপ্নেও অনুমান করিতে পারে কি না সন্দেহ।

এফিসিয়াস নগর ও বন্দরের মধ্যভাগে পাহাড়ের নিম্নস্থানে সে মন্দির নির্ম্মিত হয়। বড় বড় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে সেই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য যে ব্যক্তি সেই স্থান মনোনীত করিয়াছিল, সে মূর্খ নহে—প্রকৃতি-বিজ্ঞানে পরম পণ্ডিত। কারণ পূরাকালে

ভূমিকম্পের ভয় অত্যন্ত অধিক ছিল। সেই সময়ে তেমন প্রকাণ্ড অদ্ভুত মন্দির যাহাতে ভূমিসাৎ না হয় তাহার জন্যই পর্ব্বত নিম্নে সেইরূপ স্থান মনোনীত করা হইয়াছিল। যতই প্রবল ভূমিকম্প হউক না কেন—সে স্থানে তাহার প্রকোপ আদৌ অনুভূত হইবার নহে।

'থ্রেসিয়' জাতির ন্যায় এফিসিয়াস বাসীরাও ডায়েনা দেবীর একটি ক্ষুদ্র আব্লুস কাষ্ঠে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'ক্যানাইটিয়াস' নামক এক ভাস্কর সেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেও—দেশের সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভাবিত এবং বলিত যে 'দেবরাজ জুপিটার স্বর্গ হইতে তাঁহার কন্যা ডায়েনা দেবীর সেই প্রতিমূর্ত্তি তাহাদিগের পূজার জন্য পাঠাইয়াছেন।' এ বিশ্বাস দেশবাসীর হৃদয়ে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহারা যে সেই দেবীর পূজায় মহা সমারোহ করিবে, এবং আবাস-মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

লোকের যেমন বিশ্বাস, কার্য্যকলাপ এবং মতিগতিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইল। দেশবাসীদের উপরে সদয় হইয়া স্বয়ং দেবরাজ জুপিটার যখন আপনার কন্যা ডায়েনা দেবীকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন সেই দেবীর বাসস্থানও তদ্রূপ

হওয়া উচিত। সুতরাং দেশবাসী সকলেই ডায়েনা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ডায়েনা দেবীর মন্দির যাহাতে পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যময় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হয় তজ্জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিল।

হইলও তাহাই। যাহার যেমন চিন্তা—কার্য্যও তেমনই হয়। দেশবাসীর অসীম উৎসাহ ও উদ্যোগে মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু সে কি যেমন তেমন ব্যাপার যে সত্বর সম্পন্ন হইবে? ক্রমে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৭০ শতাব্দীতে রাজা সারভিয়াস্ টিউলিয়াসের রাজত্বকালে সেই অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হইল। কিন্তু হায়! দেশবাসীর এই দীর্ঘ বৎসরব্যাপী অসীম উদ্যমের ও সহিষ্ণুতার ফল দুরন্ত অনলে ধ্বংস হইয়া গেল।

তৎপরে আবার খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৪০ শতাব্দীতে সেই মন্দির দ্বিতীয়বার নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইল। এবার যেন দেশবাসীর উদ্যম ও অধ্যবসায় শতগুণে বর্দ্ধিত হইল—তাহার ফলে সে মন্দির এরূপভাবে নির্ম্মিত হইতে লাগিল, যে কি আয়তনে, কি গঠনে, কি জাঁকজমকে এবারকার মন্দির যেন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরকাল পরিগণিত হইতে পারে। প্রথমবারের অপেক্ষা

এবারকার মন্দির-কি আয়তনে, কি গঠনে, কি সৌন্দর্য্যে, সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিল—তত বড়, তেমন সুন্দর, তেমন আশ্চর্য্য, তেমন বিস্ময়কর ব্যাপার আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও সম্পাদিত হয় নাই। পারস্য-সম্রাট সের দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সকল দেশের সকল কীর্ত্তিই ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে 'ডায়েনা' দেবীর মন্দিরের শোভা-সৌন্দর্য্য বিরাটত্ব দর্শনে বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, অধিকন্তু ইহার সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু কি যে ভগবানের অভিশাপ—খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪০০ শতাব্দীতে দুর্ভাগ্যক্রমে এই দ্বিতীয়বারের নির্ম্মিত মন্দিরের কিয়দংশও আবার অনলে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তৎপরে পুনরায় দেশবাসীর অদম্য উৎসাহ, আগ্রহ ও চেষ্টাবলে দ্বিগুণ জাঁকজমকে সেই মন্দির পুনরায় সুসংস্কৃত ও স্থানে স্থানে বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু এই মহৎ কার্য্য কি অশুভক্ষণেই না আরম্ভ হইয়াছিল! প্রাণপাত পরিশ্রম—এমন কি হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু শোণিতদানেও দেশবাসী এ অদ্ভুত কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিল না। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৫৬ শতাব্দীতে "ইরাস্ট্রেটস্" সে কীর্ত্তি আবার বারুদের অগ্নিতে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

'ইরাস্ট্রেটস্' অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। তিনি ভাবিয়া-

ছিলেন যে পৃথিবীর মধ্যে তেমন আশ্চর্য্য বিস্ময়জনক কীর্ত্তি ধ্বংস করিতে পারিলে—তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সে মন্দির ধ্বংস করিলেন। কিন্তু দেশবাসী সেই কারণে দারুণ ঘৃণায় তাঁহার নাম মুখে উচ্চারণ পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। কিন্তু ইহাতেও "ইরাস্ট্রেটসের" উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তাঁহার নাম মুখে না আনিলেও, সকলেরই অন্তরে তাঁহার ক্রূর দানবীয় কার্য্য চিরকাল জাগরূক হইয়া রহিল।

তৎপরে এলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে সেই দিগ্বিজয়ী সম্রাট কহিলেন যে মন্দির-সম্মুখে যদি তাঁহার দিগ্বিজয়ী নাম খোদিত করা হয়—তাহা হইলে তিনি পুনরায় সেই অদ্ভুত কীর্ত্তিশালী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন, কিন্তু 'এফিসিয়াসবাসিগণ' তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না, সুতরাং সে মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল। অবশেষে এফিসিয়ানগণের অদম্য উৎসাহ ও অদ্ভুত চেষ্টাবলে সেই অদ্ভুত কীর্ত্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল।

অগ্নিদাহ হইতে এবার মন্দিরের অনেক সাজ সরঞ্জাম এবং কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছিল—সেগুলি যত্নে সংগৃহীত হইল। তৎপরে এসিয়া মহাপ্রদেশের সকল দেশ—সকল স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইতে লাগিল।

এসিয়া মহাপ্রদেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা এই মহা-কীর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ ব্যগ্র, উৎসাহিত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত আপনাদের অলঙ্কার বিক্রয়পূর্ব্বক চাঁদা প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য বহুবিধ মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীও সেই অনুষ্ঠান কল্পে প্রেরিত হইতে লাগিল। এইরূপে ডায়েনা দেবীর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্যে অগাধ ধনরাজি সংগৃহীত হইল।

এইবারে যে মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল উহার নির্ম্মাণ কার্য্য ২২০ দুই শত কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে শেষ হইল না। এফিসিয়ানগণের এই সুদীর্ঘ দুই শত কুড়ি বৎসরব্যাপী অক্লান্ত, কঠোর পরিশ্রমের ফলে যে মন্দির নির্ম্মিত হইল—সেই 'ডায়েনা দেবীর' মন্দির জগতের সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে একটি অতুলনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপাররূপে জগতের ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়া রহিল।

এই অদ্ভুত মন্দির দীর্ঘে ৪২৫ ফিট, প্রস্থে ২২০ ফিট। ৬০ ফিট্ উচ্চ ১২৭টি স্তম্ভের শ্রেণীতে গঠিত। এই সকল স্তম্ভের মধ্যে ছত্রিশটি স্তম্ভ অতুলনীয় বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত।

"চারসিফ্রন্" নামক একজন যশস্বী সুনিপুণ শিল্পী এই মন্দির গঠনের ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে এক

স্থান নির্ম্মাণে অশক্ত হইয়া তিনি আত্মহত্যার কল্পনা করিলে, রাত্রিযোগে স্বয়ং দেবী দর্শন দিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক কহেন যে তিনি আপনি সেস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

অবশেষে গথ্ জাতির তৃতীয়বার 'এফিসিয়াস্' আক্রমণ কালে তাহারা অগ্নি সংযোগে সে মহাকীর্ত্তি চিরকালের জন্য ধ্বংস করিয়া দিল।

এখন সে এফিসিয়াস্ নগরও নাই—সে 'ডায়েনা দেবীর' আশ্চর্য্য মন্দিরও নাই, কিন্তু যতকাল জগতে ইতিহাস থাকিবে, ততকাল এ মহাকীর্ত্তি অমর-ভাষায় কীর্ত্তিত হইবে।

৫। ম্যাসোলিয়াম কবর-মন্দির।

যে যাহাকে ভালবাসে তাহাকে চিরদিন কাছে কাছে চোখে চোখে রাখিতে চাহে—ইহা মানব-প্রকৃতির ধর্ম্ম। কিন্তু বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধানে মানব যখন ইহজগতের ধূলা-খেলা শেষ করিয়া পরলোকে চলিয়া যায়—তখন তাহাদের অদর্শনে—প্রিয় পরিজনেরা ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হয়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রুপ্রবাহে

প্রস্রবণের সৃষ্টি করে, কিন্তু তাহাতেও মন তৃপ্ত হয় না, আকাঙ্ক্ষা মিটে না। তখন সেই বিগত প্রিয়তম সামগ্রীর সামান্য মাত্র চিহ্ন দেখিতে পাইলেও আকুল অন্তর কতকটা শান্ত হয়—তাই চিত্রপট, প্রতিমূর্ত্তি কবর-স্তম্ভ প্রভৃতি স্মৃতি-চিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থা। এই উপলক্ষ লইয়া এ জগতে কত মহৎ মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়ে নিমগ্ন হইতে হয়। 'কেরিয়া' দেশের এই "ম্যাসোলিয়াম" নামক কবরমন্দিরও সেই প্রকার একটি স্মৃতিচিহ্ন এবং জগতের সপ্তাশ্চর্য্যের ভিতর একটি আশ্চর্য্য সামগ্রী। কেরিয়ার রাজ্ঞী "আর্টেমেসিয়া" তাঁহার পরলোকগত পতি—কেরিয়া-রাজ 'ম্যাসোলাসের' স্মৃতি সংরক্ষণার্থে এই অপূর্ব্ব কবর-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

স্নেহের সামগ্রী দূরে গেলে স্নেহের আকর্ষণ বর্দ্ধিত হয়, বিশেষতঃ সে বস্তু যখন ইহজীবনের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন সেই বর্দ্ধিত আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিও শতগুণ প্রবল হইয়া উঠে। মানব সেই হৃদয়-ভাবের আতিশয্যে—তাহার স্মৃতির সম্মান রক্ষার্থ প্রাণপাত করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। তাহাদের প্রিয়বস্তুর স্মৃতি-চিহ্ন যাহাতে সমগ্র

জগতের শ্রদ্ধা-সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য অসাধ্য-সাধনেও কৃতসংকল্প হইয়া থাকে। ইহারই ফলে—আগ্রার অপূর্ব্ব তাজ-মহলের সৃষ্টি, ইহারই ফলে কেরিয়ার ম্যাসোলিয়াম কবর-মন্দির পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্য ব্যাপারের মধ্যে অন্যতমরূপে জগতের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ম্যাসোলাস্ এবং আর্টেমেসিয়া কেরিয়ার রাজা হিকেটোমাসের পুত্র ও কন্যা। এই পুত্র ও কন্যা দুইটি তাহাদের অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য্যের জন্য সমস্ত এসিয়া মহাপ্রদেশে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ন্যায় তেমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপময় পুরুষ এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী অতুলনীয়া রূপবতী স্ত্রী—তখনকার দিনে সমগ্র এসিয়ার মধ্যে আর দুইটি জন্মগ্রহণ করে নাই। সেই মহা ভূ-ভাগের নানা নগর, দেশ, গ্রাম জুড়িয়া ম্যাসোলাস্ ও আর্টেমেসিয়ার অপূর্ব্ব রূপের কথা মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া অবশেষে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

পূরাকালে এসিয়া মহাপ্রদেশের মধ্যে 'মিশর' 'কেরিয়া' প্রভৃতি অনেকানেক স্থানে বড় বড় রাজবংশে ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহ হইত, তখন সে অদ্ভুত প্রথায় কেহ দোষারোপ করিত না, বরং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অনেক দেশগণ্য পূজ্য ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধি করিয়া সে প্রথার সমর্থন করিত। ক্রমে বিদ্যা, জ্ঞান এবং সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত এক্ষণে সে প্রথা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রাজা হিকেটোমাসের মৃত্যুর পরে রাজপুত্র ম্যাসোলাস্ এবং রাজকন্যা আর্টেমেসিয়া কেরিয়া রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন, তখন দুইজনে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কেরিয়ার রাজা-রাণী রূপে—আপনাদিগের অতুলনীয় রূপের ছটায় সিংহাসন আলোকিত করিয়া দেশময় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

তাঁহারা যে কোন্ শতাব্দীতে রাজ্য লাভ করিয়া কতকাল জীবিত ছিলেন তাহার নিরাকরণ নাই—ইতিহাস কেবল তাঁহাদের মৃত্যুর কাল ও কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

ম্যাসোলাস্ এবং আর্টেমেসিয়া ভ্রাতা-ভগ্নী রূপে শৈশব হইতে যে স্নেহের ডোরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই শৈশব-স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়া স্বামী-স্ত্রী-রূপে যখন উভয়কে বন্ধন করিল—তখন তাহা অধিকতর দৃঢ় হইয়া গেল। তৎপরে রাজারাণী রূপে যখন তাঁহারা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন সংসারের সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহাদের সমান স্বার্থ—সমান আকর্ষণ দাঁড়াইল বলিয়া সে বন্ধন চিরদিনের জন্য অক্ষয়

হইয়া গেল। উভয়েই যেন একপ্রাণ—একমন, একে দুই—দুইয়ে এক! এমন কি একজন মরিয়া গেলে অপর জন যে জীবিত থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা লোকে কল্পনা করিতে পারিল না।

কিন্তু জগতে সকলই হয়—সকলই সয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৫৩ শতাব্দীতে রাজা ম্যাসোলাস্ জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন। সকলেই ভাবিল যে রাণী বুঝি আর বাঁচিবেন না। কিন্তু জন্ম-মৃত্যু মানবের ইচ্ছাধীন নহে—রাণী আর্টেমেসিয়ার মৃত্যু হইল না। মৃত্যু হইল না বটে, কিন্তু জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন।

সে কালে সে দেশে মৃতের অগ্নিসৎকারের প্রথা ছিল। মৃত্যুর পরে রাজা ম্যাসোলাসের দেহ যখন চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল, রাজ্ঞী তখন উন্মাদিনীর মত হইলেন, সে শোকের শান্তি কোথায়, অন্বেষণ করিয়া পাইলেন না। তিনি প্রাণের আবেগে নির্ব্বাপিত চিতামধ্য হইতে পতির দেহের ভস্ম আনাইয়া—তাহা সুরার সহিত মিশ্রিত করিলেন, তৎপরে সেই ভস্ম-মিশ্রিত সুরা আকণ্ঠ পান করিয়া কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন।

তথাপি অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ হইল না। মন খাঁ খাঁ করিতে লাগিল, প্রাণের মধ্যে হা হা করিতে লাগিল।

অহোরাত্র একটা বুকফাটা বেদনা যেন তাঁহার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল। আহারে রুচি নাই, শয়নে নিদ্রা নাই, সংসারে মনোযোগ নাই—রাজকার্য্যেও শৈথিল্য জন্মিল। যাহার মনের শান্তি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে, সে কি লইয়া সাংসারিক কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবে ?

এইরূপ আকুল অস্থির হইয়া রাজ্ঞী আর্টেমেসিয়া অহোরাত্র অশান্ত ভাবে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। মন কিছুতে প্রবোধ মানে না—অন্তরের শূন্যতা কিছুতে পূর্ণ হয় না। সংসারের দশদিক যেন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই ঘোর তমসা ভেদ করিয়া কোন দিকেই শান্তি, আনন্দ বা আশার অতি ক্ষীণ রশ্মিও দেখা দিল না।

ঘরে বাহিরে, পৃথিবীবক্ষে, শূন্যে আর্টেমেসিয়া চতুর্দ্দিকে আকুল দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন—আগ্রহ-পূর্ণ চঞ্চল চক্ষে ইতস্ততঃ চাহিয়াও, কোথাও কোন স্থানে প্রিয়তম পতির বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। হায়! শৈশবাবধি এতদিন ধরিয়া যে প্রিয়বস্তু আকাশ বাতাস ভরিয়া, তাঁহার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিল, ত্রিজগৎ ব্যাপিয়া যাঁহার সজীব চিত্র দিবাবিভাবরী তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সৌন্দর্য্যের ষোল-

কলায় পূর্ণ হইয়া চাকৃচিক্যে দশদিক ঝল্‌মল্‌ করিয়া তুলিয়াছিল,—চক্ষু পালটিতে আজ সেই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপী চিত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল? কোন্‌ অতীতের অন্ধতম সুষুপ্তির কোলে চিরদিনের মত মুখ লুকাইল? কোন দিকে—কোথাও আরতো তাহার সাড়া শব্দ নাই—চিহ্নমাত্রও নাই! মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও আর কি এ জীবনে তাহার ছায়ামাত্রও দেখিতে পাওয়া যাইবে না? ভগবান, তোমার এ কি বিধান!

যতই ভাবিতে লাগিলেন—চিন্তায় চিন্তায় আকুল, অস্থির লইয়া পড়িলেন, ততই আর্টেমেসিয়ার পতি-প্রেম যেন আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই মৃত আত্মার প্রতি সমধিক সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শিত হয়, কি কার্য্যে পরলোকবাসী প্রিয়তম পরিতুষ্ট হইবেন, কোন্‌ কার্য্যে সংসারবাসী জনগণের হৃদয়ে তাঁহার পতির স্মৃতি চিরকালের জন্য জাগরূক থাকিতে পারে—এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিছুকাল ধরিয়া মনে মনে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করিবার পর অবশেষে তিনি এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

তিনি স্থির করিলেন—যদি এমন একটি স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইতে পারা যায়, যাহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে
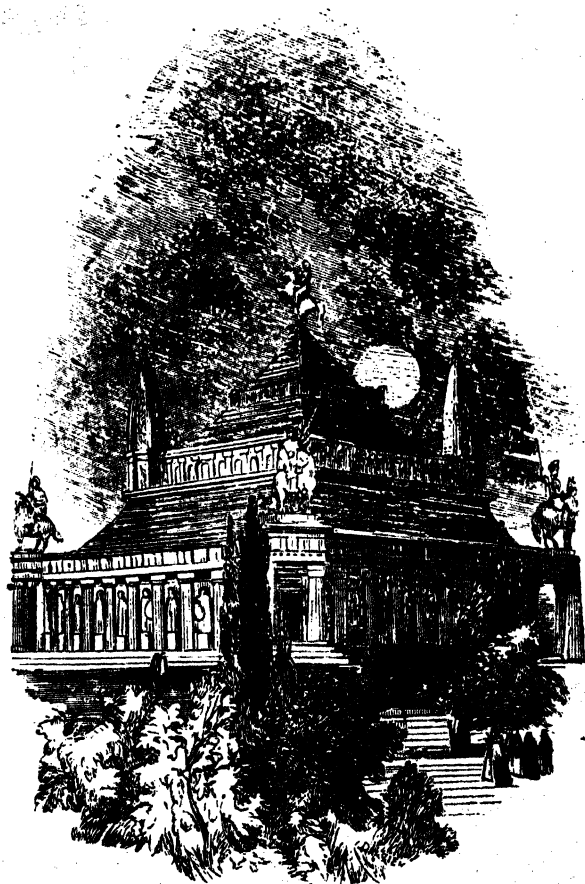
সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্ব্বাপেক্ষা কারুকার্য্যশালী, সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ তাহা হইলে জগদ্বাসী চিরকাল সবিস্ময় গৌরবের চক্ষে

তাহার প্রতি নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া থাকিবে—তাহার কথা সততই গল্প করিবে। গল্পে বিমোহিত হইয়া দেশদেশান্তর হইতে লোক ছুটিয়া দেখিতে আসিবে, এবং যে দেখিবে—তাহারই অন্তরে এই অপূর্ব্ব চিত্র চিরকালের মত অঙ্কিত হইয়া যাইবে। এইরূপে তাঁহার মৃত পতির নাম জগদ্বাসীর মুখে মুখে অমর হইয়া বিরাজ করিবে—তাঁহার পবিত্র স্মৃতি তাহারা ভক্তি ও সম্মানের সহিত অন্তরে অন্তরে পূজা করিবে। হইলও তাহাই।

কেরিয়া দেশের রাজধানী হেলিকারনেসাস্ নগরে এই কবর-মন্দির নির্ম্মিত হইল। নগরের একদিকে বন্দর—অন্যদিকে বহিঃশত্রু আক্রমণের বাধা-প্রদায়ী পর্ব্বতমালা। ইহারই নিম্নভাগে সুদৃঢ়, সুশোভিত নগর,—উচ্চে—পর্ব্বতচূড়ে 'জুপিটার' 'মার্স্' প্রভৃতি দেবতাগণের মন্দির। নগরের শীর্ষদেশে—পর্ব্বতের মধ্যস্থলে এই অপূর্ব্ব 'ম্যাসোলিয়াম' নির্ম্মিত।

এই কবর-মন্দির—পর্ব্বতগাত্রে উচ্চ-বেদীর উপরে বহু মূল্যবান প্রস্তরে নির্ম্মিত হইল। ইহা প্রায় চতুষ্কোণ —প্রত্যেক দিক ১১৩ ফিট লম্বা, এবং ষাট ফিট উচ্চ ৩৬টি করিয়া পরম রমণীয় স্তম্ভে শোভিত। চারি কোণে স্তম্ভ শিখরে চারিটি প্রস্তরনির্ম্মিত অশ্বারোহীর অতি সুন্দর প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি।

চতুর্দ্দিকের প্রাকারশীর্ষ হইতে উচ্চে ঢালু ভাবে—পিরামিডের ধরণে ছাদ উঠিয়া উচ্চতর চারিটি প্রাচীর শীর্ষে মিশিয়াছে। ইহার দুই কোণে আলিসার উপর হইতে মন্দিরাকৃতি দুইটি উচ্চ গুম্বজ উঠিয়াছে। তথা হইতে পুনরায় সেই প্রকার ছাদ উঠিয়া তদপেক্ষা উচ্চতর প্রাচীরগাত্রে সম্মিলিত। এইরূপ তিনটি স্তরে কবর-মন্দির শোভিত। সর্ব্বোচ্চ চূড়া ১৪০ ফিট উচ্চ। এই চূড়ার উপরে আবার একটি প্রস্তরনির্ম্মিত অশ্বারোহীর প্রতিমূর্ত্তি। এই প্রতিমূর্ত্তির অশ্বটি মন্দির চূড়ায় পশ্চাদ্দিকের দুই পায়ে ভর দিয়া পৃষ্ঠে আরোহী লইয়া সম্মুখের দুই পদ শূন্যে তুলিয়া আছে—ঠিক যেন মুহূর্ত্তেই লাফাইয়া পড়িবে। দূর হইতে কবর-মন্দিরটি দেখিলে মনে হইবে—যেন তিনটি পিরামিড তুলিয়া আনিয়া কেহ একটির উপর আর একটি এইভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

মন্দিরের ভিতর এবং বাহিরের প্রাচীরগাত্র নানাপ্রকার চমৎকার সুদৃশ্য কারুকার্য্যখচিত এবং অভ্যন্তর ভাগ নানারূপ সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট প্রতিমূর্ত্তিতে সজ্জিত। ইহার দুই চারটি অঙ্গহীন অবস্থায় এখনো বৃটিশ-মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু রাজ্ঞী আর্টেমেসিয়া ইহার নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ দেখিয়া

যাইতে পারেন নাই। পতির মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তিনিও তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থা-গুণে এবং কারিকরগণের ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যমে বহুবর্ষে এই গৌরবময় কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল।

৬। মিশরের 'ফেরোস্' অথবা সমুদ্রতীরস্থ আলোকগৃহ।

ভুবনবিখ্যাত মিশর প্রদেশের 'আলেকজান্দ্রিয়া' নগর ইতিহাসে চিরবিখ্যাত। মিশর এককালে জ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যসম্পদে, শিল্পে, বাণিজ্যে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য প্রদেশে পরিগণিত হইয়াছিল। জগদ্বাসী সকলেই বিস্মিত নয়নে মিশরের প্রতি চাহিয়া থাকিত এবং তদ্দেশবাসীর অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিত।

অঙ্কশাস্ত্রে, দর্শনে, বিজ্ঞানে প্রাচীন মিশরবাসীর পাণ্ডিত্য-গাথা জগতে অক্ষয় অমর হইয়া আছে। যে জ্যামিতির অনুশীলনে বর্ত্তমান সভ্যজগৎ অতীতের অন্ধ-তমসাবৃত গহ্বর হইতে উন্নীত হইয়া গৌরবমদে উচ্চে দণ্ডায়মান, সেই জ্যামিতির আবিষ্কর্ত্তা মহামতি 'ইউক্লিড'

এই গৌরবময় মিশর দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'আলেকজেন্দ্রিয়' বিদ্যালয় হইতেই শিক্ষালাভ করিয়া স্বীয় অদ্ভুত প্রতিভালোকে জগৎসংসারকে অদ্যাবধি উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছেন।

শুধু 'জ্যামিতি' কেন—বর্ত্তমান যুগের উচ্চ অঙ্কশাস্ত্রসমূহের অধিকাংশই প্রাচীন মিশর হইতে উদ্ভূত। মিশরেই গ্রহ-নক্ষত্র নিরূপণে জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রথম অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হইয়াছিল এবং সেই বিদ্যার আলোচনার অদ্ভুত প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক্ষণে জগদ্বাসীর চক্ষে এক মহারহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। বস্তুতই বর্ত্তমান সভ্যযুগে যে সকল বিদ্যাবলে আমরা গর্ব্বিত—উন্নত; যাহাদ্বারা অজ্ঞান-তমসা ভেদ করিয়া আমরা দিন দিন উন্নতিমার্গে অগ্রসর, সেই নবীন জ্ঞানালোকের উদ্ভব-নিদান প্রাচীন মিশরের নিকট আমাদিগকে চির-ঋণে ঋণী থাকিতে হইবে।

মিশর যে কেবল এই এক বিষয়ে ভাগ্যবান ছিল—তাহা নহে। লক্ষ্মী যখন যাহার প্রতি সদয় হইয়া কৃপাদৃষ্টিপাত করেন, তখন সে সর্ব্ববিষয়েই পরম সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। এককালে মিশরেরও সর্ব্ববিষয়েই শ্রীবৃদ্ধি ও সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, মহাবীর্য্যবান জনসঙ্ঘ, চমকৃপ্রদ শিল্পচাতুর্য্য, রম্য

হর্ম্ম্যাবলী, মহা মহা প্রদর্শনী, আনন্দময় রঙ্গভূমি, বিরাট পুস্তকালয় প্রভৃতি সভ্যজগতের আকাঙ্ক্ষিত যাবতীয় বিষয়েই মিশর প্রদেশ ভূমণ্ডলে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই মিশরের 'পিরামিড্' যেমন, তেমনি 'আলেকজেন্দ্রিয়া' নগরের 'ফেরোস্' অথবা সমুদ্রপথে নাবিকগণের পথপ্রদর্শক আলোকাগার যে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে একটি অশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া জগতের ইতিহাসে চিরকাল অমর প্রসিদ্ধিলাভ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

সেকেন্দার সাহ (আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট) আপনার নামেই মিশরে 'আলেকজেন্দ্রিয়া' নগরের পত্তন করেন। দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া আলেকজাণ্ডার যখন মিশরে আসিলেন, তখন এই প্রদেশের সুখসমৃদ্ধি দেখিয়া এই স্থানে স্বীয় নামে একটি বিস্তৃত নগর স্থাপন করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

তিনি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, যে এমন সুন্দর বিস্তৃত ভূভাগ—জগতের মধ্যে একটি সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ নদীর সুমিষ্ট শীতল জলে উর্ব্বর—প্রকৃতিজাত প্রাচীরে বহিঃশত্রুর জিঘাংসাপূর্ণ লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষিত—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি—পৃথিবীবক্ষে বিরল। এই স্থানে সমুদ্র-কূলে একটি সুরম্য বন্দর

নির্ম্মিত হইলে জগদ্বাসীর মহা উপকার সংসাধিত হইবে, মনে মনে এইরূপ কল্পনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি তথায় একটি বন্দর ও নগর নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইলেন।

আলেকজাণ্ডারের নিকট লোকের গুণগ্রাম অপ্রকাশিত থাকিত না। তৎকালীন দিগ্বিজয়ী সম্রাটগণের মত বিলাসী এবং তোসামোদপ্রিয় হইলেও আলেকজাণ্ডারের একটি মহৎগুণ ছিল। তিনি জগতে মহৎকার্য্য সাধনে সতত সমুৎসুক এবং পরম গুণগ্রাহী ছিলেন। সামান্য ব্যক্তির মধ্যেও কোনো একটি গুণের বা ক্ষমতার প্রাধান্য দেখিলে, তিনি তাহার আদর করিতেন। 'ম্যাসিডোনিয়া' দেশবাসী 'ডিনোক্রেটিস' নামক এক মিস্ত্রীর কার্য্যদক্ষতার বিষয় তিনি সত্বর অবগত হইলেন, এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩২ অব্দে তাহার প্রতিই এই নগর-বন্দর নির্ম্মাণের ভারার্পণ করিলেন। একদিকে ভূমধ্যসাগর এবং অন্যদিকে 'মেরিওটিস্' হ্রদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই সুরম্য নগর নির্ম্মিত হইল। নগর নির্ম্মাণে বিস্তর প্রাকৃতিক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি শিল্পকৌশল সহযোগে এই নগর নির্ম্মাণ-কার্য্য সত্বর সুচারুরূপে সাধিত হইল।

নগরের সমুদ্রতীরবর্ত্তীপ্রান্ত হইতে কিছু দূরেই সমুদ্র

মধ্যে 'ফেরোস্' দ্বীপ আয়তক্ষেত্রে—লম্বালম্বি ভাবে মস্তকোত্তোলন করিয়া বাঁধের কার্য্যে রত ছিল। প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত এই বাঁধ উত্তালতরঙ্গময় সাগরের প্রচণ্ড উর্ম্মিমালার প্রবল আক্রমণ হইতে সততই সমুদ্রতীর-বর্ত্তী সেই ভূভাগকে রক্ষা করিত। সুতরাং বন্দর নির্ম্মাণের এমন উপযুক্ত স্থান অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। বুদ্ধিমান, মহামনা, দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার এই কারণেই এই স্থানে বন্দর নির্ম্মাণে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন।

নগর ও বন্দর নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্রতী হইয়া "ডিনো-ক্রেটিস' এই ফেরোস্ দ্বীপ হইতে তীরভূমিস্থ নূতন বন্দর পর্য্যন্ত একটি সুদৃঢ় প্রশস্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া নগর ও দ্বীপ একত্রে সংযোজিত করিয়া দিলেন—ইহাতে দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ বন্দরের উপযুক্ত স্থান নির্ম্মিত হইল।

এককালে এই আলেকজেন্দ্রিয়া নগর পরিমাণে সুবৃহৎ রোমনগরের সমতুল হইয়া উঠিয়াছিল এবং সমগ্র জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে সুপ্রসিদ্ধ 'টায়ার' নগর যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূভাগের মহাবাণিজ্যের সংযোগ-স্থল রূপে জগতে গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিল—

দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বড় সাধের এই আলেকজেন্দ্রিয়া নগরও কালে তদ্রূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাভূভাগ-দ্বয়ের একমাত্র বিরাট ও অবাধ বাণিজ্যের মহামিলন স্থলরূপে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল। তথায় তৎকালে তিন লক্ষ স্বাধীন ব্যবসায়ী লোকের বাস ছিল। 'টলেমি' রাজবংশ বহু বৎসরব্যাপী রাজত্বে সে নগরের অতুল শোভা-সম্পদ বর্দ্ধিত করিয়া-ছিলেন। এই নগরের রাজকীয় বিরাট পুস্তকালয়ে (লাইব্রেরিতে) ৭০০০০০, সাত লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

কেবল তাহাই নহে—এই নগরী চারি সহস্র প্রাসাদ, চারি সহস্র স্নানাগার, চারিশত দেবমন্দির, রঙ্গভূমি, মল্লভূমি, ক্রীড়াভূমি, সাধারণ উদ্যান এবং দ্বাদশ সহস্র দোকানে—পরিশোভিত হইয়া জগতে ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-গর্ব্বে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বাণিজ্যের সুবিধা দেখিয়া চল্লিশ সহস্র ইহুদি সদাগর 'প্যালেস্‌টাইন্‌' ছাড়িয়া আলেকজেন্দ্রিয়ায় আসিয়া বাস করিয়াছিল।

কিন্তু হায় কালের কঠোর স্পর্শে সেই মহাসমৃদ্ধি-শালী নগর এক্ষণে অতীত স্মৃতির কঙ্কালমাত্র বহন করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে!

দিগ্বিজয়ী সম্রাট সেকেন্দার সাহের (আলেকজাণ্ডার

দি গ্রেট) বহু সেনাপতিবৃন্দের মধ্যে 'প্রথম টলেমি' সর্ব্বাপেক্ষা বীর ও শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার অধিকৃত প্রদেশসমূহ শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলা ব্যপদেশে যখন বিভক্ত হইয়া গেল, তখন 'প্রথম টলেমির' উপর মিশর প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হইল। সেই ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি সে প্রদেশকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

'ব্যাবিলন' রাজ্যে সেকেন্দারের মন্ত্রীসভার পরামর্শে সম্রাটের মৃতদেহ 'ম্যাসিডোনিয়ায়' রক্ষার্থ স্থিরীকৃত হয়। 'প্রথম টলেমি' বহু আয়াসে সেই দেহ তথা হইতে আনয়ন করিয়া আলেকজেন্দ্রিয়ায় স্থাপন করেন। গ্রীস্‌দেশীয় রাজগণ তাঁহার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া— মিশর দেশ অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অনবরতঃ কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই মহাসমরতরঙ্গ প্রবাহিত হয়। এই সকল যুদ্ধে টলেমি এরূপ অদ্ভুত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বিংশতি বৎসরব্যাপী বিরাট যুদ্ধের পর আর কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে দেশ আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। 'প্রথম টলেমি' খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০১ অব্দ হইতে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 'প্রথম টলেমি'
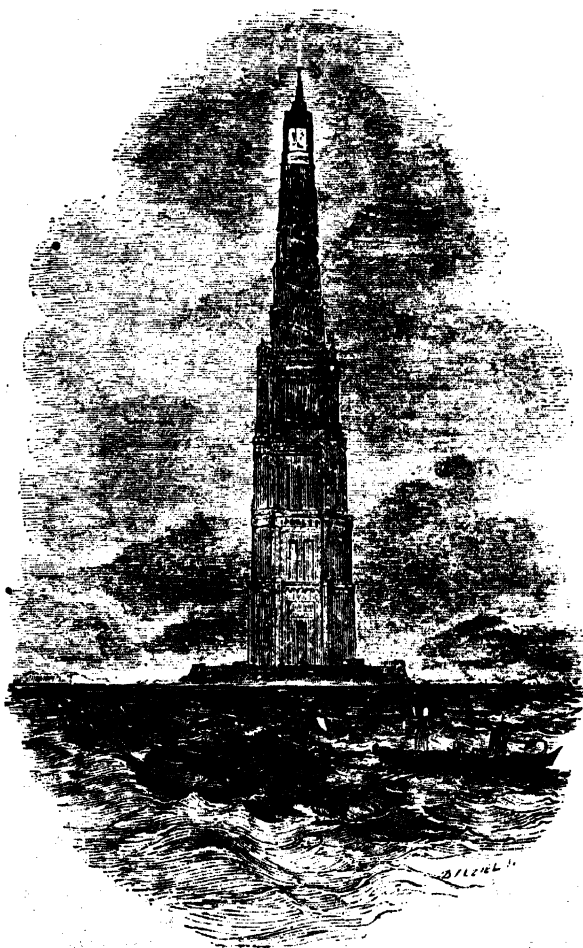
তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক ও বিপুল অধ্যবসায় বলে তাঁহার প্রাণাধিক মিশর দেশকে ধন-সম্পদে, জ্ঞান-গরিমায়,

শিল্প-বাণিজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরগণও তাঁহার অপক্ষপাত ন্যায়-বিচারের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া মৃত রাজার মনের ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রজাগণ সর্ব্ববিষয়েই সুখ-সমৃদ্ধির চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। এই আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দর হইতেই তখন ইয়োরোপে নানা প্রকার বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি হইতে আরম্ভ হয়। এই গৌরবান্বিত 'টলেমি' রাজবংশেই ইতিহাস-বিখ্যাত রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার উদ্ভব।

তৎকালে সমুদ্রপথে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া নাবিকগণ প্রায়ই বিপদের মুখে পতিত হইত। অথচ বাণিজ্যের প্রধান উপায় সমুদ্র-পোত। আলেকজেন্দ্রিয়া যখন প্রধান বন্দর হইয়া উঠিল এবং তথা হইতে চতুর্দ্দিকে —এমন কি ইউরোপে পর্য্যন্ত—অবাধ বাণিজ্যের স্রোত বহিল, তখন অর্ণবপোত সকল সমুদ্রবক্ষে বিপদে পড়িয়া ধ্বংস না হয়—তদ্বিষয়ে রাজা প্রথম টলেমির মনোযোগ আকর্ষিত হইল এবং সেই মনোযোগের ফলেই ফেরোস দ্বীপের উপর এই অত্যাশ্চর্য্য আলোক-গৃহ (লাইট-হাউস) নির্ম্মিত হইল।

এই আলোকাগার উচ্চে ৪৫০ চারিশত পঞ্চাশ ফিট

এবং সমুদ্রবক্ষে এক শত মাইল দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহা বারো তলা—একের উপর দোতলা—তৎপরে তিন তলা—এইরূপে স্তরে স্তরে গোলাকার ভাবে উপর দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা ছয় কোণ-বিশিষ্ট, চতুর্থ তলা সমচতুষ্কোণ এবং ছাদের চারিকোণে চারিটি গোলাকার গুম্বজ বিশিষ্ট। তৎপরে পঞ্চম তলা হইতে চূড়া পর্য্যন্ত বরাবর গোলাকার—তাহার অঙ্গ বাহিয়া ঘুরান সিঁড়ি উঠিয়াছে। চূড়ার নিম্নে স্তম্ভের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া গোলাকারভাবে দর্পণ সংলগ্ন—তাহাতে সমুদ্রবক্ষে বহু দূরাগত অর্ণবযানের প্রতিবিম্ব পড়িত এবং স্তম্ভশীর্ষে নাবিকগণের পথপ্রদর্শন জন্য সততই সমুজ্জ্বল দীপ জ্বলিত।

এই আলোকস্তম্ভ সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত এবং বিচিত্র কারুকার্য্যময় বিস্তর মূল্যবান মার্ব্বেল প্রস্তরে শোভিত। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রায় ১,৬৫,০০০ এক লক্ষ পঁয়ষট্টি সহস্র পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। রাজা 'প্রথম টলেমি' এই বিরাট কার্য্য আরম্ভ করিলেও শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা 'দ্বিতীয় টলেমির' রাজত্বকালে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

৭। পিত্তল মূর্ত্তি।

এই মূর্ত্তি রোডস্ দ্বীপে অবস্থিত। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০৪ সনে মেসিডোনিয়ার রাজা ডেমিট্রিয়াস্ পলিওর্সেটিস্ রোডস্ দ্বীপ আক্রমণ করেন। কিন্তু রোডস্বাসী যুদ্ধে ডেমিট্রিয়াস্কে পরাজিত করিয়া আক্রমণকারী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে দেশ হইতে বিতাড়িত করে। কথিত আছে ডেমিট্রিয়াসের পলায়নের সময় সৈন্যগণ এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা সমস্ত কামান রোডস্ দ্বীপে ফেলিয়া যায়। এই যুদ্ধের বিজয় সংবাদ চির-স্মরণীয় করিবার জন্য রোডস্বাসী ঐ সকল কামান ইত্যাদির ধাতুজ দ্রব্য দ্বারা রোমান্ অগ্নিদেব হিলিয়সের এক বিশাল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। সমুদ্র হইতে বন্দরে প্রবেশ করিবার মুখেই এই বিশালকায় মূর্ত্তি অবস্থিত ছিল। ইহার তল দিয়া বড় বড় শত শত জাহাজ অনা-য়াসে পাল মাস্তুলসহ বন্দরে প্রবেশ করিত। পিত্তল মূর্ত্তির যে চিত্র দেওয়া হইল তাহাতেই উহার আকার বুঝা যাইবে। চিত্রে পিত্তল মূর্ত্তিটী যে প্রকার দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান সময়ে ঠিক সেই প্রকার নাই, উহার নির্ম্মাণের ২।৩ শত বৎসর পরে এক পদ ভগ্ন হইয়া যায়, এখন উহার চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান আছে।
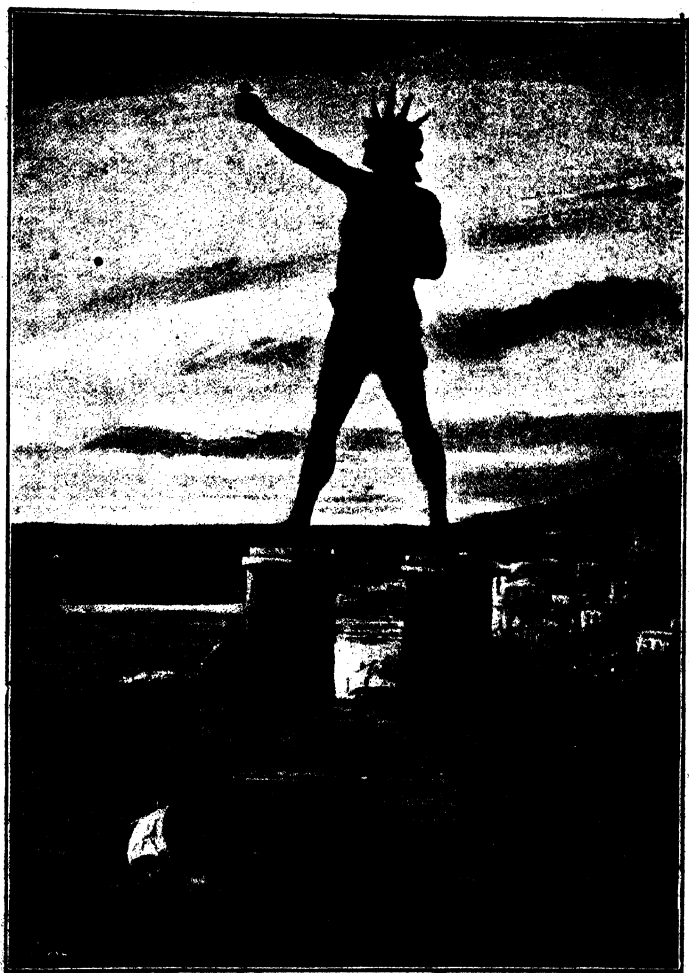
রোডস্‌বাসীদের এই একটী যুদ্ধে জয়লাভেই এত উল্লাস হওয়ায় অনেকেই অশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন

কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে ডেমিট্রিয়াসের মত প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাকে পরাজয় করা সেই যুগের লোকের পক্ষে অতি অসম্ভব কার্য্য। বহু রাজ্য ও রাজধানী জয় করিয়াছিলেন বলিয়া ডেমিট্রিয়াসের দ্বিতীয় নাম পেলিওর্সেটিস্ অর্থাৎ দিগ্বিজয়ী। রোডস্ দ্বীপ বাসীরা কেবল যে যুদ্ধেই নিপুণ ছিল, তাহা নহে। তাহারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই শিল্প বাণিজ্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ। তাহারা শিল্পবিদ্যায় কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এই পিত্তল মূর্ত্তির গঠন হইতেই তাহা বুঝা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

আধুনিক আশ্চর্য্য।

মহৎ ব্যক্তি বা আশ্চর্য্য কীর্ত্তির স্মৃতিরক্ষার্থ অচিন্ত-নীয় সুবৃহৎ অট্টালিকা বা প্রাসাদ প্রস্তুত করা বর্ত্তমান যুগে অতীব বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ এই উপায়ে কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হয় না ; কারণ, ঐ অট্টালিকা বা প্রাসাদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুণ্যস্মৃতিও চিরতরে কালের কুক্ষিগত হয়। বর্ত্তমানে যে প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে তাহাই ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে মহতী স্মৃতির সহিত সহজে পরিচিত করার প্রকৃষ্ট উপায়। কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া মর্ম্মর স্তম্ভ বা সৌধমালা নির্ম্মাণ না করিয়া যত্ন ও অধ্যবসায় মাত্র ব্যয়ে মহৎ কীর্ত্তি ও ব্যক্তি সমূহের প্রকৃত ইতিহাস উদীয়মান নবীন সম্প্র-দায়ের সম্মুখে স্থাপন করাই বর্ত্তমান সভ্য জগতের রীতি হইয়াছে। তাই আর বৃহৎ 'পিত্তল মূর্ত্তি' বা 'শূন্যোদ্যান' নির্ম্মিত না হইয়া এখন সামান্য প্রস্তর মূর্ত্তি বা শিক্ষা মন্দিরই মৃতের স্মরণ চিহ্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে পেট্রোগ্রেড্স্থিত পিটার্-দি-গ্রেট এর প্রতিমূর্ত্তিই সর্ব্ববৃহৎ বলিতে পারা যায়। সম্রাট্ অশ্বারূঢ়—সম্রাটের মূর্ত্তিটি

১১ ফিট উচ্চ এবং ঘোড়াটী ১৭ ফিট উচ্চ। ইহা ব্রঞ্জ (Bronze) দ্বারা তৈয়ারি—সমস্তটী আবার এক বৃহৎ গ্রেনাইট প্রস্তর খণ্ডের উপর স্থাপিত। বেভেরিয়ার মিউনিক নগরে স্থিত জার্ম্মাণ দেবীর (Vrigin of the german world) যে মূর্ত্তিটি আছে তাহাও ৫৪ ফিটের কম হইবে না। এই সমস্তটি আবার ৩০ ফিট উচ্চ গ্রেনাইট প্রস্তর স্তম্ভের উপর স্থিত। উইণ্ডসরপার্কে একটি কৃত্রিম পাহাড়ের উপরে তৃতীয় জর্জ্জের যে অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহাও ২৬ ফিট উচ্চ। পাহাড়ের উচ্চতা শুদ্ধ এই মূর্ত্তি মৃত্তিকা হইতে ৫০ ফিট উচ্চ। এই তিনটি বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তম মূর্ত্তি (Colossus) বলা যাইতে পারে। নিম্নে কতকগুলি আধুনিক আশ্চর্য্যের বিবরণ লিখিত হইল।

তাজমহল।

আগ্রা নগরের তাজমহল দেখিবার সুযোগ সকলের না ঘটিয়া থাকিতে পারে কিন্তু উহার নাম বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। ইহা অধুনা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য দৃশ্য। বর্ত্তমান সময়েও বহু দূরদেশ হইতে
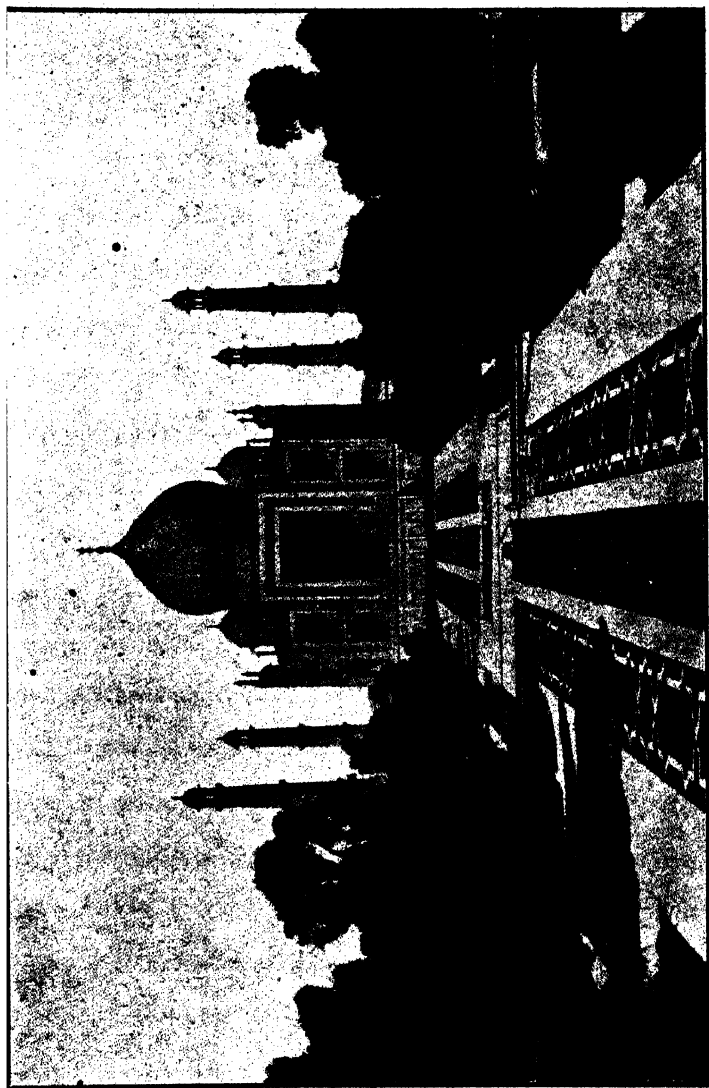
পরিব্রাজকগণ শুধু তাজমহলের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যও ভারতবর্ষে আগমন করেন। এ সকল দৃশ্যের প্রতিকৃতি দেখিয়া বা তাহার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া সে সৌন্দর্য্য কি শোভার ধারণা করা সহজ নহে।

তাজমহল এবং ময়ূর সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া সম্রাট সাহজাহান ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মম্‌তাজ-মহল নামে সম্রাট সাহজাহানের এক বেগম ছিলেন। তিনি সম্রাটের জীবিতাবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সম্রাট শোকে অধীর হন। পরে স্বীয় পত্নীর নাম ভুবনবিখ্যাত করিবার জন্য তাহার সমাধির উপর শুধু মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা এক সুশোভন ও সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আগ্রা রাজপ্রাসাদের অতি সন্নিকট যমুনা নদীর গর্ভ হইতেই এই মন্দির নির্ম্মিত। আজ কাল যমুনা নদীর বেগ কমিয়াছে। তাজমহল এক্ষণে উহার তীরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। সম্রাট্ প্রাসাদ হইতে সর্ব্বদা প্রিয়তমা পত্নীর সমাধি দর্শন করিবার মানসেই দুর্গের এত সন্নিকটে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। তাজমহলের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত, উহাতে কৃত্রিম উপবন, ফোয়ারা ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। ঠিক সমাধি ক্ষেত্রের উপর দ্বিতল মন্দির

নির্ম্মিত। সমাধি মন্দির এক বিস্তৃত চতুষ্কোণ চত্বরের উপরে গঠিত। মন্দির চত্বর সমস্তই শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত। এই মন্দিরের উপরিভাগ একটি সুবৃহৎ গুম্বজ দ্বারা সুশোভিত। এই ডোম বা চূড়াও শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ও বিবিধ সুন্দর কারুকার্য্যখচিত। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন তলে দুইটি সমাধি পাশাপাশি রহিয়াছে। একটি বেগম মমৃতাজমহলের এবং অপরটি সম্রাট্ সাহজাহানের।

মন্দিরের সংলগ্ন চত্বরের চারিকোণে চারিটা চূড়া (অর্থাৎ মনুমেণ্ট) আছে। উহাদের উচ্চতা মন্দিরের গুম্বজের উচ্চতা হইতে অধিক হইবে। তাজমহলের বহির্ভাগের শোভা অপেক্ষা মন্দিরের অভ্যন্তরের শোভা আরও মনোহর। কক্ষের প্রাচীর সমূহে নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর ও মণিমাণিক্য দ্বারা লতাপাতাফুল প্রভৃতি এরূপ অভিনব সুন্দর ভাবে গঠিত যে প্রথমবার দৃষ্টিতে উহা বিবিধ বর্ণে অঙ্কিত (Painted) বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে দেখিলে উহার প্রকৃত শোভা হৃদয়ঙ্গম হয়। কথায় সে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায় না। তাজমহলে যে কারুকার্য্য আছে পৃথিবীর অন্য কোথাও তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তাজমহলের সঙ্গে কাহারও তুলনা চলে না। ইহা অভিনব সুন্দর।

কথিত আছে, ভারতবর্ষে বর্গীদিগের দমনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ শ্লিম্যান্ সাহেব নিযুক্ত হইলে, তিনি এক সময়ে তাঁহার পত্নীসহ ভুবনবিখ্যাত আগ্রার তাজমহল দেখিতে যান। তাজ দেখিয়া ফিরিবার সময় শ্লিম্যান্ সাহেব তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাজ কেমন দেখিলে, বল দেখি ?" তাহার উত্তরে সাহেবপত্নী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "যাহা দেখিয়াছি তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। ইহা কখনও আমি ভুলিব না। তবে আমার কবরের উপর যদি কেহ ঐরূপ তাজ তৈয়ার করিবে স্বীকার করে, তবে আমি এখনই মরিতে প্রস্তুত।"

টেমস নদীর তলবর্ত্ম।

টেমস নদীর তীরে ভুবনবিখ্যাত লণ্ডন নগর অবস্থিত। নদীর উভয় তীরেই সহর, সুতরাং পারা-পারের জন্য সেই প্রকার সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত। এই জন্য টেমস নদীর উপরে যেমন বহু সেতু, আবার তলেও তেমনি কয়েকটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। লণ্ডন নগরের বিপুল বাণিজ্যের জন্য এই টেমস নদী বিশেষ বিখ্যাত। নদীর উপরস্থ সেতুগুলির নির্ম্মাণ কৌশল অভিনব এবং সুন্দর, কিন্তু তাহা অপেক্ষা পারাপারের

সুড়ঙ্গগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল আরও শতগুণে আশ্চর্য্যজনক। উপরে নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ যাইতেছে আসিতেছে, আবার এদিকে নদীর তলদেশের মাটীর নীচে অদ্ভুত সুড়ঙ্গপথ দিয়া রেল গাড়ী ও লোকজন স্বতন্ত্রভাবে যাতায়াত করিতেছে। কি আশ্চর্য্য কৌশল! ইহা কোন্ মহাপুরুষের কল্পনা জান কি? ইহা ইঞ্জিনিয়ার ব্রুনেলের মহাকীর্ত্তি। যাহা এককালে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া অর্দ্ধনিষ্পন্ন না হইতেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল, যাহার নির্ম্মাণকল্পনা স্বপ্নের প্রলাপ বলিয়া সর্ব্বত্র উপহসিত হইয়াছিল, তাহাই মহামান্য ব্রুনেল নিজ অধ্যবসায়ে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি পার্লিয়ামেণ্টের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, গভর্ণমেণ্টের টাকায় ১৮২৫ সাল হইতে এই সুড়ঙ্গপথ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৩ সালে তাঁহার কার্য্য শেষ হয়। ইহা প্রথমতঃ লোকজনের জন্যই খোলা হয়, উহাতে ৬১৪,০০০ পাউণ্ড খরচ হয়। উহা এখন ইষ্ট লণ্ডন রেলওয়ে কোম্পানীকর্ত্তৃক রেলপথে পরিণত হইয়াছে। ইহাছাড়া ব্ল্যাকওয়াল ও গ্রেণীচের মধ্যে সর্ব্ব সাধারণের যাতায়াতের জন্য একটি বড় সুড়ঙ্গ পথ আছে। এবং বৈদ্যুতিক রেলের জন্যও আর একটি পথ আছে। সর্ব্বপ্রথম সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে ব্রুনেল সাহেবকে অত্যন্ত বেগ পাইতে

হইয়াছে। কতবার যে নদীগর্ভের মাটি ভেদ করিয়া বালুকা ও জল সুড়ঙ্গের নির্ম্মাণপথে প্রবেশ করিয়া সকল কার্য্য নষ্ট করিয়াছে তাহার সীমা নাই। কিন্তু তবু ব্রুনেল সাহেব হতাশ হন নাই। তিনি বিপুল অধ্যবসায়ে ভর করিয়া কাজ করিতেন! যখন পুনঃ পুনঃ নদীগর্ভ ভেদ করিয়া জল উঠিতে লাগিল তখন হাজার হাজার থলে মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া জাহাজের সাহায্যে সুড়ঙ্গ পথের উপরিস্থ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে যখন যে স্থানে থলে নিক্ষেপ করা হইল, তখন সেখানে থলের মাটিতেই অনেক জল শোষিত হইতে লাগিল। এই সুযোগে তিনি সেই সেই অংশের সুড়ঙ্গপথ ইষ্টক নির্ম্মিত করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পরে লোহার দৃঢ় ফলক দ্বারা বৃহৎ আকারের নল প্রস্তুত করিয়া, পুনঃ কাষ্ঠফলক দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ মোড়াইয়া সুড়ঙ্গপথে বসাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের পরে সুড়ঙ্গপথ প্রস্তুত হইয়াছিল। এখনও জগতের সকলে ব্রুনেলের অধ্যবসায়ের ও পরিকল্পনার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

চীনের সীমাপ্রাচীর।

এই বিপুলকায় মহাপ্রাচীর পৃথিবীর আশ্চর্য্য মধ্যে একটি অতীব অদ্ভুত কীর্ত্তি। যে সময়ে নিষ্ঠুর ও

ঘণ্টার রাজা। ইহার ইংরাজী নাম "জার অব্ বেল্‌স্" যথার্থই হইয়াছে। সমগ্র ঘণ্টাটির ওজন দুই শত টন। শুধু ভাঙ্গা টুকরা টুকুর ওজনই দশ টন। ইহার ভিত্তির উপর হইতে ষোল ফিট উচ্চ এবং ভিত্তি-সংলগ্ন অংশের পরিধি ৫৮ ফিট। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘণ্টার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। দুই বৎসর পরে তখনও তৈয়ার শেষ হয় নাই এমন সময় কারখানায় আগুণ লাগিয়া কারখানা বাড়ীটি ভূমিসাৎ হয়, তাহাতে ঘণ্টাটির প্রদর্শিত অংশ ভাঙ্গিয়া যায়। তারপর ইহা ঐ অবস্থায়ই পতিত থাকে। ক্রমে মাটী পড়িয়া ইহা প্রায় ঢাকিয়া যায়। এক শত বৎসর পরে মাটী খুঁড়িয়া ঘণ্টাটি বাহির করিয়া ইহার বর্ত্তমান ভিত্তির উপর স্থাপিত করা হইয়াছে। এই ঘণ্টা কখনও বাজান হয় নাই বা বাজাইতে চেষ্টা করাও হয় নাই—কিন্তু ইহার আকারেই শুধু ইহাকে পৃথিবী-প্রসিদ্ধ করিয়াছে।

পিসার হেলান মন্দির।

ইটালী প্রদেশ মধ্যে পিসা একটী সুন্দর সহর। পিসা নগরে বহু সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্যমালা আছে। তন্মধ্যে

হেলান মন্দির বা বেল্ টাওয়ারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা কেরারা মর্ম্মর প্রস্তরে প্রস্তুত। ইহার দরজাগুলি ব্রঞ্জ দ্বারা নির্ম্মিত। কেরারা প্রস্তরগুলি কাচের ন্যায় মসৃণ ও স্বচ্ছ এবং দিবাভাগে যখন সূর্য্যালোক মন্দিরের উপর পতিত হয় তখন ইহার উজ্জ্বলতায় চোখ ঝলসিয়া যায়, মনে হয় মন্দিরটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে প্রস্তুত। আবার ইটালীর নিসর্গসুন্দর সূর্য্যাস্তকালে ইহা ক্রমান্বয়ে নানারঙ্গে রঞ্জিত আকাশ ও মেঘের বর্ণ ধারণ করে। ইহার এই শোভা অতুলনীয়। প্রাচীনকাল হইতেই ইহার এই বঙ্কিম আকারের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা হইতেছে। প্রাচীনেরা মনে করিতেন শিল্পিগণ স্বীয় পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্যই এরূপ হেলান ভাবে মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু আজ কাল সুনিপুণ ইঞ্জিনিয়ারগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে ইহার তলদেশস্থ মৃত্তিকার অস্থায়িত্ব গুণেই মন্দিরটী নির্ম্মাণকালেই এইরূপ হইয়াছে—তাহার পর শত চেষ্টায়ও ইহাকে ঠিক সোজা করা যায় নাই। তবে এই হেলান মন্দিরে জগতের এক শুভ কাজ হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত গ্যালিলিও—মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত গুণসকল এই হেলান মন্দিরে বসিয়াই সহজে স্থির করিয়াছিলেন।

পিসার হেলান মন্দির

পৃথিবীর আশ্চর্য্য - ১৩ পৃষ্ঠা
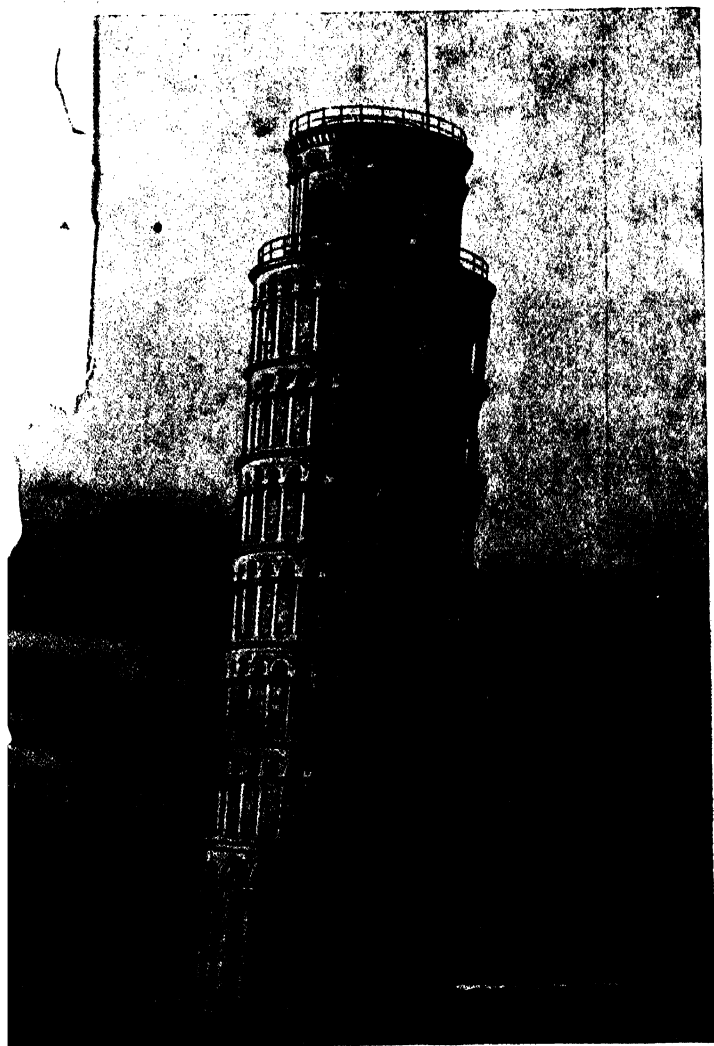
নিউ ইয়র্ক।

মেট্রোপলিটান লাইফ বিল্‌ডিং।

উত্তর আমেরিকার মার্কিণ প্রদেশের প্রধান বাণিজ্য নগর নিউ-ইয়র্কে প্রায় ৬৭ টী নভস্পর্শী (Sky-scrapers)

হর্ম্ম্যমালা আছে। বাণিজ্যের বিস্তারে লোকসংখ্যা ও ব্যবসায় এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সাধারণতঃ প্রচলিত

ফ্ল্যাটিরন বিল্‌ডিং।

পাঁচতলা কি ছয়তলা বাড়ীতেও আর সঙ্কুলান হয় না। কাজেই বাড়ীগুলি শুধু উঁচুদিকেই ক্রমে বাড়াইতে

হইয়াছে; কারণ, বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে কেহই ইচ্ছুক নহেন। এই সকল নভস্পর্শী ব্যবসায়-প্রাসাদের একটীও দশতালার নীচু নাই। তবে সর্ব্ববিষয়ে বৃহৎ ও সুন্দর এবং সর্ব্বোচ্চ হইল মেট্রোপলিটান লাইফ বিল্‌ডিং (Metropolitan Life Building) এবং ইহার সংলগ্ন টাওয়ার। ইহার পরই ফ্ল্যাটিরন বিল্‌ডিং (Flatiron Building), Flatiron Building একটী X (ইংরেজি অক্ষর এক্‌স্) এর আকারে গঠিত। ইহাতে সমুদয়ে কুড়িটি তালা আছে এবং রাস্তা হইতে কার্নিস পর্য্যন্ত ২৮৬ ফিট উচ্চ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এবং আশ্চর্য্যজনক হইল মেট্রোপলিটান লাইফ্ প্রাসাদের টাওয়ার। মূল প্রাসাদ—ছবিতে যাহার মাথায় নিশান উড়িতেছে—ঐটী ১১ তালা এবং ১৬৪ ফিট উচ্চ। কিন্তু সংলগ্ন টাওয়ারটীতে একটী তালা আছে এবং রাস্তা হইতে চূড়া ৭০০ ফিট উচ্চ। যে প্রকার মন্দির নির্ম্মাণে বেবিলন অকৃতকার্য্য হইয়াছিল মার্কিণবাসী তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। এই সমস্ত প্রাসাদই ইট সুড়কিদ্বারা প্রস্তুত কিন্তু প্রথমতঃ দৃঢ় লৌহ স্তম্ভদ্বারা আগাগোড়া ফ্রেম করা হইয়াছে। তাহার উপর ইটের গাঁথুনি হইয়াছে। উপরের তালা সমূহে উঠিবার জন্য সিঁড়িও আছে কিন্তু সিঁড়িদ্বারা এত উচ্চে উঠা এক

প্রকার অসম্ভব, তাই বিদ্যুৎ চালিত লিফ্‌ট্‌ আছে, তাহাদ্বারা মুহূর্ত্তে উপর হইতে নীচে এবং নীচ হইতে উপরে যাওয়া যায়।

নায়গারা জলপ্রপাত।

উত্তর আমেরিকার নায়গারা জলপ্রপাত বর্ত্তমানে জগতের একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য। ইহা ক্যানেডা ও মার্কিণ এই দুই রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী। শীতকালের বরফাচ্ছাদিত হ্রদ ওণ্টারিও, ইরাই, হুরণ ও মিশিগান যখন গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বরফ গলিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন অপেক্ষাকৃত নিম্নদেশগুলি জলে প্লাবিত হইয়া এক ভীষণ জলস্রোত সৃষ্ট হয়—জল অবশ্য পর্ব্বতময় উত্তর প্রদেশে যাইতে পারে না, দক্ষিণ দিকেই প্রবাহিত হয়। এই হ্রদগুলি হইতে মিশিশিপি নদীতে যে সকল স্রোত আসিয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে বৃহত্তমটীর উৎপত্তি স্থলই নায়গারা জলপ্রপাত। ইহার স্রোত এত বেগবান্‌ যে সময়ে সময়ে পাহাড়ের অন্তস্তর ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন একটি টানেল কাটিয়া ইহার জল চলিয়া যায়। চিত্রে যে অংশ দর্শিত হইয়াছে ইহাকে 'অশ্বখুর-প্রপাত' (Horse-shoe Falls) বলে। এখানে ১৫০ ফিট

উচ্চ হইতে জল পড়িতেছে। ইহার গম্ভীর পতন শব্দ বহুদূর হইতে শোনা যায়। শীতকালে ইহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়। বরফে সমুদয় অংশ আবৃত, বরফের
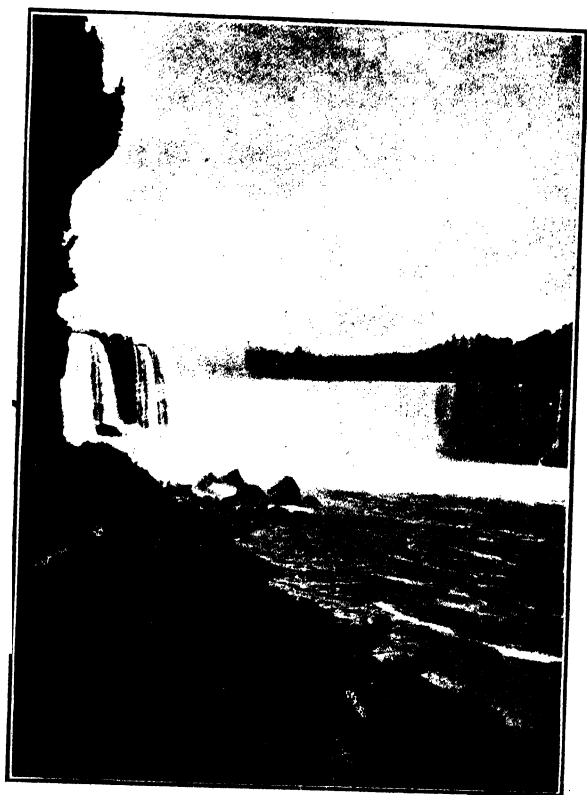
নীচে বেশ স্রোত চলিয়াছে, বরফগুলি সঙ্গে সঙ্গে নীত হইতেছে। কিন্তু সকল অংশই বরফ আবৃত বলিয়া

চক্ষু প্রতারিত হয়—বরফ নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়। যেখানে কোনও কারণে বরফের পাতলা স্তর আছে অথবা একটু ফাঁক হইয়াছে সেখানে অমনি নূতন বরফ সৃষ্ট হইতেছে তখনই স্রোতের গতি অনুভূত হয় এবং নূতন সৃষ্ট বরফ সূর্য্যালোকে নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময়ের শোভা অতুলনীয়। তার পর রাত্রিতে চারিদিক অন্ধকার—শুধু স্রোতজলটুকু এক খণ্ড সাদা কাপড়ের ন্যায় দেখায়, আর গভীর গর্জ্জন শোনা যায়। এই প্রপাতের বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন সময়কার দৃশ্য দেখিবার জন্য আমেরিকার সর্ব্বত্র হইতে এমন কি ইউরোপ হইতে বহু পরিব্রাজক ও দর্শক এইস্থানে, গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যাইয়া থাকেন। ইহার শোভা অতুলনীয়।

জ্যোতিষ্মান্ মৎস্য।

আমেরিকা আবিষ্কারের পর আটলাণ্টিক ও প্যাসিফিক সাগরে বহু অদ্ভুত অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য আকৃতি ও গুণবিশিষ্ট জলজন্তু প্রথম দৃষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাশ্চর্য্যময় এই
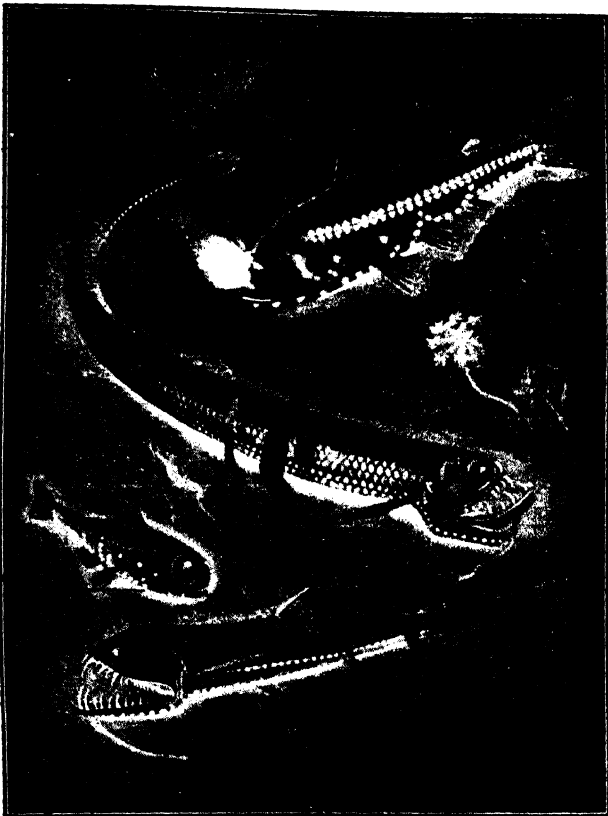
জ্যোতিষ্মান্ মৎস্য।

জ্যোতিষ্মান্ মৎস্য (Self-luminant Fishes)। উপরিস্থ চিত্রে কতকগুলির আকৃতি ও আলোকের সংস্থান দেখান হইয়াছে। একেবারে উপরে যেটী আছে তাহার

নাকের উপর ঠিক জাহাজাদির সার্চ্চ (Search) লাইটের ন্যায় একটি বৃহৎ আলোকের ন্যায় জ্যোতিঃ এবং শরীরের অপরাংশে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল আলো আছে। তার নীচেরটী ঠিক একটী সাপের ন্যায়—ইহা সমুদ্রের গভীর-তম প্রদেশে বাস করে। বলা বাহুল্য এত তলদেশে বিশেষ আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা ইচ্ছামত আলোক বিস্তার করিতে ও নিভাইতে পারে—কাজেই অন্ধকারে যাইতে যাইতে হঠাৎ আলোক বিস্তার করিয়া পলায়নপর শিকার ধরিয়া ফেলে। তন্নিম্নটী একটী ক্ষুদ্র মৎস্য—ইহার আলোক মোটেই উজ্জ্বল নহে। চতুর্থটী অতি ভয়ানক জানোয়ার। ইহার আলোকও প্রথম দুইটীর ন্যায় উজ্জ্বল নহে কিন্তু আপন ইচ্ছায় নিভাইতে ও প্রকাশ করিতে পারে।

সমাপ্ত।